ভোরের স্বপ্ন

বুদ্ধদেব গুহ

ভোরের স্বপ্ন

The Online Library of Bangla Books

ভোরের স্বপ্ন

গাছটা কত বড় হয়ে গেছে না?

শেষ কবে দেখেছিলেন?

ঠিক মনে নেই। তবে অনেকই বছর আগে। চারুমামার সঙ্গে এসেছিলাম এ বাড়িতে আপনার বাবার সঙ্গে দেখা করতে। সে বেশ কয়েক যুগ আগে হবে। কিন্তু আশ্চর্য। গাছটার কথা মনে আছে।

অন্য প্রসঙ্গে গিয়ে খোড়া বলল, বড় তো হবেই। বেড়ে ওঠাই তো গাছের স্বভাব। মানুষের মতো তো নয় গাছেরা।

— মানুষ কি বেড়ে ওঠে না?

— আয়তনে হয়তো বাড়ে। চরিত্রে এবং মানসিকভাবে অনেকক্ষেত্রে হয়ত বাড়ে না। বাড়লে, তা খুবই সুখের কথা হতো।

— কার সুখ?

— সকলেরই সুখ। যারা তাকে চেনে জানে, তার সঙ্গে ঘর করে, তাদের সুখ।

তারপরে খোড়া বলল, গাছটাকে মনে আছে আর আমাকে মনে নেই?

লজ্জিত হয়ে অর্পন বলল, গাছটাকে মনে নেই। তবে তখন হয়ত জন্মাননি আপনি। নয়ত খুবই ছোট ছিলেন।

তারপরে বলল, এটা কী গাছ?

— ছাতিয়ান। আপনাদের রাঢ় বাংলায় যাকে ছাতিম বলে। দেবেন ঠাকুর যে গাছতলাতে ধু-ধু প্রান্তরে পালকি থামিয়েছিলাম আর পরে রবিঠাকুর বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেখানে।

— ওই গাছটা কী গাছ? নদীর পাড় ঘেঁসে হয়েছে? কী বিশাল গাছটা। বাঁ-দিকের একটি মস্ত গাছ দেখিয়ে জিগগেস করল অর্পণ খোড়াকে।

— ওই গাছের নাম আকাতরু। ছাতিয়ান গাছও তো ছোট গাছ নয়। আমার ঠাকুমা পুঁতেছিলেন ছাতিয়ান গাছটা। যদিও জমিটা আমাদের মালিকানা ছিল না।

— তাই?

তারপর অর্পণ বলল, গাছের নাম আকাতরু?

— হ্যাঁ।

— আশ্চর্য নাম তো। বলেই বলল, গাছ পুঁততে কোনো বিশেষ দাবি না থাকলেও চলে।

মাটি বা সেই মাটির মালিক কোনো প্রতিবাদ করে না, না?

তখনকার দিনে করত না কিন্তু এখন করে। তবে এ কথা ঠিক যে, ডুয়ার্সের এদিকের গাছেদের নামগুলোর সঙ্গে অন্য জায়গায় গাছেদের নাম মেলে না। এদিকে গাছও অগণ্য।

— নদীই বা কম কী?

—তা ঠিক।

— আর নদীদের নামগুলো এবং তাদের সৌন্দর্যও তো মুগ্ধ করে।

— সত্যি! এদিকের নদীরা তিস্তা, তোর্ষা, কালজানি, রায়ডাক, সেলা, ডিমাই সবাই-ই ভারী সুন্দর।

খোড়া বলল।

আমাদের তো মুগ্ধ করেই, আপনাদের করে কী না জানি না।

— শুধু নদীই নয়, নারীরাও মুগ্ধ করে।

— এই কথাতেই চমকে উঠে খোড়া একবার অর্পণের দিকে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল, তাই? করে বুঝি?

— করেই তো!

— শুধু নদী কেন? এখানে নদরাও সুন্দর। এদিকে নদীর চেয়ে নদই কিন্তু বেশি।

— তাই?

— হ্যাঁ।

— ডুয়ার্সের দিকে আপনি আগে আসেননি বুঝি?

— বললামই তো। একেবারেই যে আসিনি এমন নয়, এসেছিলাম কিন্তু তখন স্কুলের নিচু ক্লাসে পড়ি। এবং এ অঞ্চলে ছিলামও মাত্র মাসখানেক। আমার এক দূরসম্পর্কের মামা তখন তুরতুরি চা-বাগানের ম্যানেজার ছিলেন। চারুমামা। তাঁর কাছেই এসে উঠেছিলাম মায়ের সঙ্গে, বাবার মৃত্যুর পর। তখন আমাদের খুবই দুর্দিন। আমার মা তো এম. এ পাশ ছিলেন। বাংলাতে এম. এ। বাবা কমার্সের ছাত্র ছিলেন। রাইটার্সে কাজ করতেন। এবং কবিতাও লিখতেন। ব্যর্থ কবি। বাংলার ছাত্রী এবং সুশ্রী মায়ের প্রেমে পড়ে অনেক কাণ্ড করে বিয়ে করেছিলেন। তখনকার দিনে 'লাভ ম্যারেজ' আজকালকার মতো জলভাত ছিল না। তার ওপরে মায়েরা কায়স্থ আর বাবা ব্রাহ্মণ। তবু আমার দাদু খুবই উদার প্রকৃতির এবং প্রকৃত শিক্ষিত

মানুষ ছিলেন বলেই পাড়ার অতি সাধারণ ঘরের 'রেফ্যুজি' মেয়ের সঙ্গে বাবার বিয়েটা হতে পেরেছিল।

আপনারা বুঝি খুব বড়লোক ছিলেন?

ঝোড়া জিগগেস করল অর্পণকে।

বড়লোক ঠিক ছিলাম না তবে যা শুনেছি, সম্পন্ন অবশ্যই ছিলাম। পূর্ববঙ্গের "বড়লোকদের" নিয়ে পশ্চিমবঙ্গীয়রা অনেকেই রঙ্গ তামাশা করতেন। বলতেন, সব বাঙালেরই একশ বিঘা ধান জমি, দোতলা দালান, মস্ত পুকুর এসব ছিলই। সবজনের হয়ত ছিল না কিন্তু অনেকেরই ছিল সত্যি সত্যিই। দেশ হারানোর দুঃখ, মানসম্মান, অনেক সময়ে ইজ্জৎ হারাবার গভীর দুঃখের উপরে এই সব হাসি-ঠাট্টা কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মতো বাজত। তবে এ বাংলাতেও ছিল বেশ কিছু স্বস্তি।

কিন্তু ঠাকুর্দার মৃত্যুর পরে আমার জেঠারা তাঁর ছোট ছেলে ভোলে-ভালা বাবাকে ঠকিয়ে বাড়ি থেকে বার করে দেন এবং সেই দুঃখ আমার কবি-ভাবাপন্ন বাবা সইতে না পেরে হঠাৎই মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সেই হার্ট-অ্যাটাকে চলে যান। আমার কলকাতাবাসী আত্মীয়-স্বজন, যাঁরা বহুদিন হলো কলকাতাতেই থিতু এবং অবস্থাপন্ন, তাঁরা সকলেই বাঙাল বিশেষ করে উদ্বাস্তুদের দুচোখে দেখতে পারতেন না। তাঁদের মনোভাব এমনই ছিল যেন মানুষে শখ করে উদ্বাস্তু হন। বাঙাল উদ্বাস্তুদের ওপরে কলকাতায় পুরোনো অধিকাংশ বাসিন্দাদেরই অনেকেরই আতক্রোধ ছিল। যদিও এই আক্রোশের পিছনে কোনো যুক্তি ছিল না।

একটু চুপ করে থেকে অর্পণ বলল ঝোড়াকে :

— আপনার বাবাকে কে না চিনত এই অঞ্চলে। আলিপুরদুয়ার কলেজের নামকরা বাংলার অধ্যাপক অশেষ মিত্রকে সকলেই তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ও ভালোমানুষীর জন্যে সম্মান করতেন। চারুমামার মুখেই শুনেছি। চারুমামা তুরতুরি চা-বাগান থেকে জয়ন্তী নদীর ব্রিজ পেরিয়ে রাজাভাতখাওয়া হয়ে আলিপুরদুয়ারে আসতেই সপ্তাহে অন্তত একবার আপনার বাবার সঙ্গে আড্ডা দিতে আসতেন। আপনার বাবাও যেতেন কখনও সখনও তুরতুরিতে। আপনার সুন্দরী মাকে আমি একবারই মাত্র দেখেছিলাম। ও বয়সেও আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে চারুমামার এক বিশেষ দুর্বলতা ছিল তাঁর প্রতি।

বা-বা। আপনি বেশ পাকা ছিলেন তো।

পাকা কি না জানি না তবে আমার সাধারণ বুদ্ধি সমবয়সী অনেকের চেয়েই প্রখর ছিল।

তুরতুরিতে সামান্য দিনই ছিলাম। তারপর চারুমামাই মায়ের জন্যে একটা

চাকরি ঠিক করে দেন মালদার এক স্কুলে। আসলে, আপনার বাবার মুসাবিদাতেই সেই কাজটা পান মা। আপনার বাবার দয়া না পেলে সেদিন ভেসে যেতাম আমরা। মালদাতে অবশ্য দুতিনমাস ছিলাম, তারপরেই চলে যাই রায়গঞ্জে। বলেইছিতো তখন আমার বয়স নয়-দশ। রায়গঞ্জে মা আবার বিয়ে করেন ওঁর স্কুলেরই এক শিক্ষককে। মায়ের একটা অবলম্বনের খুবই প্রয়োজন ছিল। তখন বুঝতাম না, এখন বুঝি। তারপর আমাকে দার্জিলিংয়ে পড়তে পাঠিয়ে দেন ওঁরা। দার্জিলিংয়েই থাকতাম সাহেবি স্কুলের হস্টেলে। তারপর গ্র্যাজুয়েশনের পর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসের পরীক্ষাতে বসে আইআরএস হই। কিছুদিন পরেই আমার পোস্টিং যখন জলপাইগুড়িতে হয় তখন ভারী খুশি হই এই অঞ্চলে আসবার সুযোগ পাব বলে। চাকরিতে জয়েন করার পরে আলিপুরদুয়ারে এই আমার প্রথমবার আসা।

রেভিন্যু সার্ভিসে কী কাজ করেন আপনি?

এখন ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টে অ্যাডিশনাল কমিশনার আমি।

— ভাগিস এসেছিলেন। নইলে তো আলাপই হতো না।

জলপাইগুড়িতে এসেই আপনার বাবার ঠিকানা যোগাড় করে চিঠি লিখেছিলাম। উনিই সব খবরাখবর দিয়ে আমাকে চিঠি দিয়েছিলেন, এখানে আসার আমন্ত্রণও জানিয়েছিলেন। ওঁর কাছেই জানতে পাই যে ওঁর একমাত্র কন্যা স্কুলের শিক্ষিকা এবং এখানের কলেজের এক অত্যন্ত জনপ্রিয় অধ্যাপকের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। দেখুন, ওঁকে চমকে দেবার জন্যে আগে না জানিয়ে এলাম এসে দেখছি উনিই নেই। কলকাতাতে গেছেন। মানে, আপনার বাবা।

— বা-বা। আমাদের সব ঠিকুজি-কুষ্ঠি মুখস্থ করে রেখেছেন দেখছি আপনি।

— রাখব না কেন? আপনার বাবার কাছে ঋণ তো আমার কম নয়।

মা এবং আমার নতুন-বাবা এখন মালদাতে ছোট্ট বাড়ি বানিয়ে থাকেন। ওঁদের একটি মেয়ে হয়েছিল। সে দুর্ভাগ্যক্রমে পাঁচ বছর বয়সেই দুদিনের জ্বরে মারা যায়। নতুন-বাবা এবং মা দুজনেই চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। দুজনেই নানা সেবামূলক কাজ নিয়ে থাকেন। শিশুদের জন্যে একটি অবৈতনিক স্কুল চালান। জলপাইগুড়িতে এসে জয়েন করার পরেই গেছিলাম একবার। জলপাইগুড়িতে আমার কোয়ার্টার বেশ বড়। ওঁদের আসতেও বলেছি , আমার কাছে থাকতেও।

আসেননি?

না। ওঁদের অবকাশ নেই। মানুষে যখন চাকরি-বাকরি করেন তখন তাঁদের তবু অবকাশ থাকে। যখন নিষ্কাম কাজ করেন, তখন বোধহয় বেশি করে বাঁধা পড়ে যান। ছুটি আর নেওয়া যায় না তখন।

ঝোড়া বলল, হয়ত তাই-ই

মা এখন গুরু রবিশংকরের ভক্ত হয়েছেন।

তাই?

ঝোড়া বলল।

মা কিন্তু আপনার বাবার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন বরাবর। না-রাখটাই আশ্চর্যের ব্যাপার হতো, অকৃতজ্ঞতারও। মায়ের মাধ্যমেই তো আপনার বাবার ঠিকানা পাই আমি।

এবার কি বাড়ির দিকে ফিরবো আমরা? বেলা তো অনেক হলো। খাওয়া-দাওয়া করবেন তো। ওকে মোবাইল-এ ফোন করে দিয়েছি। ও চলে আসবে দুপুরে খাওয়ার সময়ে, আলাপ তো সকালেই হয়েছে। সম্ভবত বিকেলে আর যাবে না কলেজে।

কাল পরশু তো ছুটিই! চলুন, ও ফিরলে কোথাও যাওয়ার একটা প্রোগ্রাম করা যাবে।

অর্পণ বলল, আমি বরং সার্কিট হাউসেই ফিরে যাই। ড্রাইভারও তো খাবে। সে তো আপনাদের বাড়ির সামনে গাড়ি লাগিয়ে গাড়িতে বসেই হাই তুলছে। বিকেলে না হয় আসা যাবে আবার।

আপনার কি একা বাড়িতে আমার সঙ্গে সময় কাটাতে সংকোচ হচ্ছে? নাকি কোনো প্রোটোকলের ব্যাপার-ট্যাপার আছে?

অর্পন অপ্রতিভ হয়ে বলল, কী যে বলেন।

তারপর ঝোড়া বলল, আপনার ড্রাইভারও আমাদের ওখানেই খাবে।

— তার কী দরকার। ও গাড়ি নিয়ে সার্কিট হাউজেই চলে গিয়ে খেয়ে আসবে। ওর খাওয়ার তো সেখানে বলাই আছে। আমারও।

— যা ভাল মনে করেন। আমার তো আজ ক্লাস নেই। ও-ও চলে আসবে ক্লাস অফ করে। বলছিল যে, ওর কোচিং ক্লাসও বন্ধ রাখবে আজ আপনাকে সঙ্গ দেবার জন্যে। খাওয়া-দাওয়ার পরে চলুন আমরা আপনার ছেলেবেলাতে দেখা সব জায়গাতে ঘুরে আসব। স্মৃতিমন্থন হবে।

তারপর বলল, এঁদের, মানে, আপনার মা-বাবাকেও একবার আসতে বলুন না। আমাদের কোয়ার্টারে তো বাড়তি ঘর আছেই, তাছাড়া বাবার বাড়িও তো খালি। মা চলে যাবার পরে বাবা তো একাই থাকেন। একটি কাজের মেয়ে আছে শুধু।

— আপনাদের একটি সন্তানের খুবই প্রয়োজন।

— অর্পণ বলল।

কেন? হঠাৎ এই কথা।

একটু অপ্রতিভ এবং সামান্য বিরক্ত হয়ে বলল ঝোড়া।

আপনাদের নিজেদের জন্য যতটা নয়, আপনাদের বাবার জন্যে অবশ্যই। যেহেতু উনি একা হয়ে গেছেন, একটি নাতি বা নাতনি থাকলে ওঁর অবকাশ ও একাকিত্বটা অনেকটাই পূরণ হতো।

— বা-বা! আপনি দেখছি মন পড়তে পারেন। বাবা তো সোজাসুজি বলেন না কিন্তু হাবেভাবে এ কথা প্রায়ই বলেন। বলেন, আজকালকার ছেলেমেয়েদের রকম সকমই আলাদা। পাঁচ বছর হানিমুনেই কাটায় তারা। সময়ে সন্তান না এলে তাদের মানুষ করে তুলবি কবে?

— আপনি কী বলেন?

— আমি কিছু বলি না। যা বলার ওই বলে। বলে, আজকালকার ছেলেমেয়েরা মানুষ যে হবেই, Robot বা অমানুষ হবে না, তা কে বলতে পারে?

তারপরে বলল, তাছাড়া, আমাদের দুজনেরই খুব বেড়ানোর সখ। এইতো ঘুরে এলাম গত বছর গ্রিসে। দেশের মধ্যেও অনেক জায়গাতে ঘুরি, ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়ি।

ও তো ভূগোলের অধ্যাপক — ভূগোল তাইই ভাল লাগে। আরও দুবছর পর টাকা জমিয়ে কেনিয়া-তানজানিয়াতে যাব ভেবেছি পূর্ব আফ্রিকা দেখতে। আর্নেস্ট হেমিংওয়ের স্নোজ অব কিলিমানজারো আর বিভূতিভূষণের চাঁদের পাহাড়ের দেশে।

অর্পণ বলল, চাঁদের পাহাড় কিন্তু পূর্ব আফ্রিকাতে নয়। সত্যিই যদি যান তো আমি সঙ্গী হব। হেমিংওয়ে আমার প্রিয় লেখক। উনি প্রতিবছর শীতে শিকারে যেতেন আফ্রিকাতে। আফ্রিকার শীতকাল জুন-জুলাইয়ে, জানেন তো? পশ্চিম আফ্রিকার রুয়েনজোরি রেঞ্জে 'মাউনটেইন অব দ্য মুন' নামের একটি পাহাড় আছে সত্যি সত্যিই। বিভূতিভূষণ তো আর আফ্রিকাতে যাননি। ঘরে বসে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের ম্যাগাজিন পড়ে কল্পনা দিয়ে কেমন লেখা লিখেছিলেন— ভাবা যায়? [illegible] এমন মানুষদেরই বলে।

— ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে পড়েও আপনি বাংলা সাহিত্য পড়েছেন এ কথা জেনেও ভাল লাগে। আজকালকার বাংলা মিডিয়াম স্কুলের ছেলেমেয়েরাই তো বাংলা পড়ে না।

ওসব বাহানা। তারা সব অশিক্ষিত মা-বাবার সন্তান। যে মানুষ নিজের মাতৃভাষার সাহিত্য পড়ে না, গান শোনে না, তারাও কি মানুষ! সত্যি! মাঝে

মাঝে মনে হয় বাংলা ভাষাটা বোধহয় শুধুমাত্র বাংলাদেশেই বেঁচে থাকবে, ফুলফলন্ত হবে. আর ভারতের পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্যান্য রাজ্য থেকে বাংলা ভাষা মুছে যাবে। এই লজ্জা রাখার কোনো জায়গা কি আছে আমাদের?

— ঠিকই বলেছেন। এখন অবন ঠাকুর, রবি ঠাকুর, সুকুমার রায়, বিভূতিভূষণ আর কে পড়ে! হ্যারি পটার আর এনিড ব্লাইটন পড়িয়ে ছেলেমেয়েদের মা-বাবা শ্লাঘাতে স্ফীত হয়ে ওঠেন। শিক্ষাটা এখন শুধুই তড়িঘড়ি টাকা রোজগারের জন্যে। অর্থই একমাত্র গন্তব্য। এ ব্যাপারে একটা হেস্তনেস্ত করার সময় এসেছে।

চলুন ফিরি এবারে।

তোড়া বলল।

আমার জন্যে কি বিশেষ কিছু রান্না করেছেন? নেমন্তন্ন না করেই রান্না করে ফেললেন?

আমরা পূব বাংলার মানুষেরা ওরকমই। আমরাও তো রেফ্যুজিই। মায়ের কাছে শুনেছি মায়েদের দেশ বরিশালে গ্রামের পুকুরে গলায় দড়ি বেঁধে কাউট্যা ছেড়ে রাখা হতো। অতিথি এলেই সে কাউট্যা জল থেকে তুলে চিৎ করে ফেলে পেট কেটে দারুণ স্বাদু কাউট্যার ঝোল ভাত, মসুরির ডাল আর আলুভাজা দিয়ে দিব্যি অতিথি সৎকার করা হতো। অতিথি আসারই অপেক্ষা। পূব বাংলার মানুষে এখনও পশ্চিম বাংলার মানুষদের চেয়ে অনেক বেশি আন্তরিক। 'আসেন-বসেন' বললে যতখানি উষ্ণতা ও আন্তরিকতা প্রকাশ পায় 'আসুন-বসুনে' তা কখনই পায় না।

কী রেঁধেছেন তা বললেন না কিন্তু।

এখানে বিশেষ কিছু আর কী রাঁধব। এখানের যা স্পেশ্যালিটি। বোরোলি মাছ, তেকাঁটা মাছ, মূর্তি নদীতে একরকমের ছোট মাছ পাওয়া যায়, নাম পাথরচাটা মাছ। মূর্তি এখান থেকে অনেক দূর তবুও লোক পাঠিয়েছিলাম কিন্তু মাছ পাওয়া যায়নি। বছরের এ সময়টাতে এ মাছ পাওয়া যায় না। এখন এসেছেন, শিলবিলাতি আলু খাওয়াতে পারব। তবে বালেশ্বরের দই আনিয়েছি। একটু মিষ্টি পোলাও আর পাঁঠার মাংসও করেছি। আমার মা খুব ভালো রান্না করতেন ওই পোলাও আর মাংস।

তারপরে বলল, জানি না, আমার রান্না আপনার ভালো লাগবে কী না! রান্না ও বাড়ির কাজের জন্যে একজন কম্বাইন্ড হ্যান্ড আছে বটে তবে রান্নাটা আমি আজ নিজে হাতেই করেছি। সব পদ। আমার বাবার প্রিয় 'অপু' কতযুগ পরে আসছেন। বাবা থাকলে কত খুশি হতেন। তবে আমাদের জানিয়েই গেছেন।

খুবই জরুরি কাজ ছিল। ওঁর একটি বই এক প্রকাশক ছেপে দিয়েছেন।

বাবা ফিরে আসুন তারপরে আবার আসবেন একবার।

মাত্র একবারই আসতে বলছেন? আপনি দেখছি কলকাতার লোক হয়ে গেছেন।

লজ্জা পেয়ে ঝোড়া বলল, একবার কেন? যতবার খুশি আসুন। রোজই আসুন।

অসময়ে এসে পড়াটা কি ঠিক হবে?

আপনি যখনই আসবেন তখনই সুসময়। বাবার কিন্তু কালকেই ফেরার কথা। তবে মোবাইলে কোনো ফোন করেননি, তাই মনে হচ্ছে কাল আসবেন না। বাবার বাড়ি আমাদের বাড়ির কাছেই। আমাদের বাড়ি এলে বাবা লাইব্রেরি ঘরে বসে থাকেন। খাবারের চেয়ে বই-ই বাবার অনেক প্রিয়। এ মাসের ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক জার্নাল এসেছে কিনা তিনবার খোঁজ নিয়েছেন কলকাতা যাওয়ার আগে। যদি জার্নালটি এসে গিয়ে থাকে আজ তবে তো কথাই নেই। তা নিয়েই বসে থাকবেন — এত অপু অপু করেও হয়ত আপনার সঙ্গে ভাল করে কথাই বলবেন না।

— তাই তো ভাল। আমি তো অতি সাধারণ। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের জার্নালের সঙ্গে আমার কি কোনো তুলনা চলে।

— হাসল ঝোড়া। বলল, ভালই বলেছেন।

— তারপর বলল, আমার স্বামী কিন্তু একটু কাঠখোট্টা। প্রথমে তাকে আপনার ভাল নাও লাগতে পারে।

অর্পণ বলল, দেখলাম ত সকালবেলাতে। তার মানে পাথরের মধ্যে জল আছে। তার হদিস পেতে হবে। তাই তো? ভালমানুষ, খাঁটি মানুষেরা সচরাচর কাঠখোট্টাই হন। কথা-বার্তাতেও রেশমের মতো মসৃণ হন না।

ঝোড়া হেসে বলল, ভারী সুন্দর কথা বলেন তো আপনি। আপনি কি লেখেন টেখেন নাকি?

— না, না, লেখা টেখা কি সকলের আসে?

— আপনার বাবা তো কবি ছিলেন শুনেছি। আমার অরিজিনাল বাবারই মতো।

— কবিতাকে ঘরে আনার পরে আমার বাবা কবিতার পাট চুকিয়ে দিয়েছিলেন। আমার মায়ের নাম ছিল কবিতা। জানেন তো?

— জানব আর না! বাবার কাছে আপনার মায়ের কত গল্প শুনেছি। নতুন-বাবার কাছে নয়, আমার অরিজিনাল বাবার কাছে।

— নতুন-বাবা আসার পরে তাকে মেনে নিতে আপনার অসুবিধা হয়নি?

বলেই, ঝোড়া বলল, বড্ড ব্যক্তিগত হয়ে গেল প্রশ্নটা, না? মাফ করবেন আমাকে।

— না, ব্যক্তিগত আর কী: আজকাল স্ত্রী বা পতিবিয়োগ না হলেও ডিভোর্স তো হচ্ছে ঘরে ঘরেই। আজকালকার ছেলেমেয়েদের মনের মধ্যে নতুন-বাবা বা নতুন-মা এলে কী হয় তা বলতে পারব না তবে আমার মনে যে ঝড় উঠেছিল তা প্রশমিত হতে অনেকেই সময় লেগেছিল। এমন সুন্দর সকালে সেসব কথা থাকলই না। 'কে আর হৃদয় খুঁড়ে হায় বেদনা জাগাতে চায়।' পরে কখনো বলব এখন, যখন নিজে থেকেই বলতে ইচ্ছে করবে।

— বেশ। তাই-ই ভালো।

— হুঁ।

কবিতা পড়েন আপনি?

— যে মানুষ কবিতা পড়ে না, গান শোনে না , সেও কি মানুষ?

— জানি না। আশেপাশে অনেক মানুষকেই তো দেখি, যাঁরা অন্যরকম।

কথাটাতে একটু চমকে গেল অর্পণ।

বলল, তাই?

কোনো উত্তর দিল না ঝোড়া।

যেমন ভেবেছিল অর্পণ ঠিক তেমন নয় দৃপ্ত সেন। মানুষটার আবরণটা তো শক্তই হয়ত ভিতরটাও শক্ত। ঘোড়াকে যে অর্পণের খুবই ভাল লেগেছে প্রথম দর্শণেই একথাটা গোপন রাখাটা সম্ভব হয়নি অর্পণের পক্ষে, কিন্তু গোপন রাখাটা উচিত ছিল। এই পৃথিবীতে সকলেই উদার হয় না যদিও মুখে সকলেই দাবি করে নিজেকে উদার বলে। আসলে অর্পণ এসব ব্যাপারে চিরদিনই বোকা। ওর মধ্যে কোনো কাপটা নেই, মনে যা, মুখে তাই-ই। এবং এই স্বভাবের জন্যে তাকে খেসারতও কম দিতে হয় নি এ পর্যন্ত।

মুসৌরির ট্রেনিংয়ের সময়ে তার ব্যাচমেট নীপা আওয়াস্থির সঙ্গে তার যে একটি মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তা নিয়ে ওর উচ্ছাসের কোনো অভাব ছিল না। তাদের ব্যাচের সকলেই এ কথা জানত। নীপা উত্তরপ্রদেশের এক রাজপরিবারের মেয়ে ছিল। বড়ো খানদানের। সে অর্পণকে ভালবেসেছিল ঠিকই কিন্তু উত্তর প্রদেশীয়দের মধ্যে যে কাপটা সচরাচর দেখা যায় তা তার মধ্যেও বেশ বেশি পরিমাণেই ছিল। ছিল বলেই, অর্পণের এই ছেলেমানুষী নীপাকে একটু বে-আব্রু করে দিয়েছিল। যে ঘটনাকে তার পূর্ণ পরিণতির আগের মুহূর্ত অবধি আড়াল করে রাখাটাই 'শিক্ষিত' মানুষদের কাছে প্রত্যাশার, তাকে প্রথমেই আগল-খোলা করে দেওয়াতে নীপা অর্পণের 'বচপনা' ক্ষমা না করে পুরনো গুটিপোকার মতো নিজের আবরণের মধ্যে নিজেকে নতুন করে গুটিয়ে নিয়েছিল। এবং তা করাতে অর্পণ ব্যাচমেটদের নির্মল কিন্তু নিষ্ঠুর হাসির খোরাক হয়েছিল।

কিন্তু নীপা-কাহিনী থেকেও শিক্ষা পায়নি সে একটুও। নীপা ফরেন সার্ভিস পেয়েছিল এবং এখন মস্কোর ভারতীয় এমবাসিতে আছে। বিয়ে করেছে ওদের চেয়ে চার ব্যাচ সিনিয়র একটি জাঠ ভদ্রলোককে। তিনিও ফরেন সার্ভিসেই আছেন।

এটা কী জায়গা?

স্বগতোক্তির মতো হঠাৎই বলল অর্পণ।

ওই তো রাজাভাতখাওয়া।

এত তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেলাম!

পথ তো সামান্যই, দেরি হবার তো কথা ছিল না।

তারপর দৃপ্ত বলল, আজ আমরা এখানেই থাকব।

রিজার্ভেশন করে এসেছেন?

লাগবে না। পশ্চিমবঙ্গের ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট করপোরেশনের নতুন বানানো গেস্ট হাউসে হয়ত জায়গা পাওয়া যাবে না। না পাওয়া গেলে কলকাতাতে অতীনদাকে একটা ফোন করবো মোবাইলে।

— অরীশদাটা কে?

— অরীশ ঘোষ। ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট করপোরেশানের ম্যানেজিং ডিরেক্টর। আর ওই গেস্ট হাউসে যদি জায়গা নাই-ই পাওয়া যায় তবে বক্সা টাইগার প্রজেক্টের ফিল্ড ডিরেক্টর বিস্ত সাহেবকে ফোন করব।

বিস্ত সাহেব মানে?

এস. এস. বিস্ত. উনিও ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিসের।

ঝোড়া দৃপ্তকে বলল, তুমি কোন যুগে পড়ে আছো? তুমি তো এদিকে বহুবছর পরে এলে তাই কোন খোঁজই রাখো না।

না রাখলে, ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট করপোরেশনের নতুন বাংলোর কথা জানলাম কী করে!

এই বাংলোর কথা নিশ্চয়ই শুনেছ তোমার কোনো ছাত্র বা চেলা-চামুণ্ডার কাছ থেকে। কাগজেও একাধিক বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল, তাই দেখে থাকবে। তপনদার কাছ থেকে থেকেও শুনে থাকতে পারো। কিন্তু বিস্ত সাহেব এখান থেকেই দার্জিলিংয়ের কনসার্ভেটর হয়ে চলে গেছিলেন। এখন দিল্লিতে আছেন এলিফ্যান্ট প্রজেক্টের ডিরেক্টর হয়ে। আরও পরে চিফ-কনসার্ভেটর হয়ে যাবেন। হয়তো শিগগিরই।

কোন তপনদা?

অর্পণ জিগগেস করল।

তপন সেন এখানের পাবলিক প্রসিকিউটর ছিলেন, যিনি রিটায়ার করেছেন গত বছর। তপনদারা এখানকার ছেলেমেয়েদের নিয়ে প্রতিবছর ভুটান পাহাড়ে ট্রেকিং আর মাউন্টেনিয়ারিং করেন। বদ্যিরা তো দারুণ ক্লানিশ হয়। দৃপ্ত সেন আর তপন সেনের মধ্যে আদান-প্রদান তো থাকবেই।

ঝোড়া বলল।

অর্পণ হেসে ফেলল।

বলল, কথাটা খুব একটা খারাপ বলেননি। বদ্যি এবং বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে এমন একটা জনশ্রুতি আছে বটে।

— দৃপ্ত বলে উঠল — অথচ এরা দুই-ই কিন্তু বাঙাল এবং পরে রিফ্যুজি। উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্রভূমি হচ্ছে রংপুর, দিনাজপুর, পাবনা, রাজশাহী, ইত্যাদি নিয়ে — আর ওখানকার ব্রাহ্মণদেরই বলে বারিন্দ্র ব্রাহ্মণ। উঁচু নাসা, উন্নত ললাট, মেধাবী। লাহিড়ী, মৈত্র, সান্যাল, ভাদুড়ি, চৌধুরি, এবং 'ছুপা' রায় এঁদের পদবি। আর সেন, সেনগুপ্ত, গুপ্ত, দাশগুপ্ত, এরা হলেন বদ্যি। বদ্যি পূর্ববাংলা ছাড়া হয় না। আজ যাঁরা অধিকাংশই উদ্বাস্তু। রায় ও রায়চৌধুরীও আছেন এঁদের দলে।

রায়চৌধুরীতো জমিদারী পদবী।

তা ঠিক।

সে তো বরেন্দ্ররাও। মানে, উদ্বাস্তু।

অর্পণ বলল, একথা ঠিক। অবশ্যই ঠিক। পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা যে অবিশ্বাস্য সংগ্রাম করে পশ্চিমবঙ্গে এবং ভারতের অন্যত্র নিজেদের ঠাঁই করেছিল তা পৃথিবীর ইতিহাসে লেখা থাকবে। তারা পূর্ব পাকিস্তানের সরকার এবং ভারত সরকার এই দুইয়েরই কাছে ব্রাত্য ছিলেন। কী সব জমিদারি ছিল, ঠাঁট-বাট, পাইক, বরকন্দাজ, শিকার, লাইব্রেরি, গান-বাজনা, বিশেষ করে উচ্চাঙ্গ সংগীত। এখন তো সবই ইতিহাস। বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে যাচ্ছে, সে ইতিহাস। পশ্চিমবঙ্গে থিতু হওয়া হিন্দুদের তরুণ প্রজন্মরা বলে, আমাদের দেশ পূর্ববঙ্গে, ঢাকা না বরিশাল কোথায় যেন ছিল। ঠিক কোথায় তা জানি না, বাবা-মায়েরা বলতেন, আসলে ঠাকুর্দা-ঠাকুমারা। তাঁরা তো এখন কেউই নেই, তাই ঠিক কোথায় তা বলতে পারবো না। বোঝো ব্যাপার।

ঝোড়া বলল, দৃপ্ত যে ইনকোহেরেন্ট তা জানতাম কিন্তু আপনিও যে ওরই মতো দেখছি। কোনো কথার খেই নেই। কোন প্রসঙ্গ থেকে কোন প্রসঙ্গে এসে গেলেন। দৃপ্তর তো অকালে ডিমেনশিয়া হয়েছে বলে মনে হয় আমার। আপনারও কি তাই হলো?

অর্পণ বলল, গত মাসে মায়ের চিঠিতে জানলাম যে, আমার নতুন-বাবার নাকি অ্যালঝাইমার ডেভেলপ করেছে।

কী করে বুঝলেন রুণা মাসি?

— মাকেই মাঝে মাঝে চিনতে পারেন না না কি?

— দৃপ্ত বলল, মাকে মাঝেই পরস্ত্রীকে নিজের স্ত্রী বলে মনে করছেন? আমার মতো? তা করলে তো সুলক্ষণ। জীবন মধুময় করার সদুপায়।

তিনজনেই হেসে উঠল ওরা।

তারপর ইংরেজিতে বলল অর্পণ নিজে গাড়ি ড্রাইভ না করলে কোনো প্রাইভেসিই থাকে না।

— তা ঠিক। আমি তো ড্রাইভার অ্যাফোর্ডই করতে পারবো না। সে জন্যেও বটে এবং আপনি যা বললেন সে কারণেও, নিজের গাড়ি চালাব।

— গাড়ি কিনছেন বুঝি?

অর্পণ কৌতূহলী হয়ে জিগ্যেস করল।

— আগামী এপ্রিলেই কিনব। যে ছেলেটি আমার খাতাপত্র রাখে, ইনকাম-

ট্যাক্স সামলায় সে জন্য এপ্রিলে কেনাই ভাল পুরো বছরের ডিপ্রিসিয়েশন পাওয়া যাবে।

মাইনে যাঁরা পান তাঁদের তো কোনো অ্যাসেটের উপর ডিপ্রিসিয়েশন দেওয়া হয় না।

আমি তো শুধুই মাইনে পাই না। ছাত্র পড়াই যে! সেটা তো একটা প্রফেশন। তার রোজগারের থেকে তো ছাড় পাবো, না কি? ঠিক বলেছে ছোকরা?

হ্যাঁ। ঠিকই বলেছে।

ওরা গাড়িতে বসে রইল, দৃপ্ত নেমে গেল ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট করপোরেশনের বাংলোতে জায়গা খালি আছে কিনা খোঁজ করতে।

অর্পণ বলল, কী সুন্দর ছোট্ট লাইনটা না? সিংগল লাইন না?

এই লাইন ডবল হয়ে যাবে শুনেছি।

— হাতি তো ওই লাইনের ট্রেনেই কাটা পড়ে প্রায়ই।

— হুঁ। কাগজে তাই তো দেখি।

— জলপাইগুড়ি থেকে মংপোতে যাবেন একবার।

— মংপু?

— না, না, সে তো মৈত্রেয়ী দেবী আর রবীন্দ্রনাথের জন্য বিখ্যাত। মংপু তো কালিম্পংয়ের কাছে। এ হলো মংপো। করোনেশান ব্রিজ দিয়ে তিস্তা পেরিয়ে মালবাজারের দিকে কিছুটা গিয়েই পথের ডানদিকে পড়ে। পথ থেকে দেখা যায় না। একটি বড় বাংলো আছে আর দুটি কটেজ। ওখান থেকে ট্রেইন লাইনকে কী সুন্দর যে দেখায় না, কী বলবো। দূরে গভীর বনের মধ্যে দিয়ে তিস্তা বয়ে যাচ্ছে দেখা যায় আর ঘন বনের মাথা দিয়ে এই রেইল লাইনটি জঙ্গলকে দুভাগ করে চিরে দিয়ে চলে গেছে। তবে ওই বাংলাতে যেতে হয় বসন্তকালে। অনেক নিচে ফুল-ফলন্ত জঙ্গলের শোভাই তখন অন্যরকম হয় আর সেই বহুবর্ণ বনের মধ্যে দিয়ে কোনো খয়েরি-রঙা সরীসৃপের মতো ট্রেনটা যখন যায় বা আসে তখন সে এক আশ্চর্য সুন্দর দৃশ্য।

এখনই তো বসন্তকাল।

তাই তো।

এমন সময়ে ফিরতে দেখা গেল দৃপ্তকে।

কী হলো? ঝোড়া জিগগেস করল।

দুদিকে মাথা নাড়ল দৃপ্ত।

ঝোড়া বলল, অরীপ ঘোষ সাহেব যদি বদ্যি হতেন তবে দৃপ্ত সেনের জন্যে অবশ্যই জায়গা হতো।

নাঃ। আজকাল বড় বড় শহর থেকে বন-বাদাড়ে এত পর্যটক আসে যে এই বন-বাদাড়ের মধ্যে যারা জন্মাল, বড় হলো, তাদেরই ঠাঁই হয় না। আদেখলাপনা।

খোড়া আর অর্পণ দুজনেই দৃপ্তর উচ্ছ্বাসে হেসে উঠল।

— শুধু আজই নয়, আগামী তিন মাসে কোনো ঘর খালি নেই।

— বাঃ! খুব ভালো লক্ষণ তো।

অর্পণ বলল।

— কেন? কিসে ভাল লক্ষণ?

— মানুষ যে এত প্রকৃতিমনস্ক হয়েছে, খুবই দেরি করে হলেও যে অবশেষে হয়েছে, এটা ভাল লক্ষণ নয়!

তা ঠিক।

খোড়া বলল।

এর পেছনে বুদ্ধদেব গুহ'র চক্রান্ত আছে। বাঙালি জাতটাকেই এমন বন-পাগল করে তুলেছেন ভদ্রলোক যে সেই হ্যাপা পোয়াতে হচ্ছে আমাদেরই।

দৃপ্ত বলল, শুধু বন-পাগলই নয়, প্রেম-পাগলও। ভদ্রলোককে জেলে পোরা দরকার।

প্রকৃতিই তো আমাদের শেষ অবলম্বন। আমাদের অন্য মা। বেশ কয়েক বছর আগে এই শিরোনামের একটি প্রবন্ধ পড়েছিলাম দেশ পত্রিকাতে।

মনে আছে। 'অন্য মা'। ভদ্রলোককে পুরস্কৃত করা উচিত। বনবিভাগের উচিত কোনো একটি বন ওঁর নামে নামাঙ্কিত করা।

দৃপ্ত বলল। সে কি আর হবে এদেশে। এখানে কেউ দেখেও দেখে না, শুনেও শোনে না। আশ্চর্য উদাসীন এই দেশ।

খোড়া বলল, সেদিন আমার এক ছাত্রী অন্য চোখে নামের একটি বই দিয়েছিল পড়তে। ভারি ভাল লাগল পড়ে। ঐ লেখকেরই লেখা।

প্রকাশক কে?

অর্পণ বলল।

কলকাতার আনন্দ পাবলিশার্স।

বাংলা বই কিন্তু আমি বেশি পড়িনি। শরৎবাবুতে এসেই থেমে গেছিলাম। আপনি তো বাংলার শিক্ষিকা। ভেবে-চিন্তে আধুনিক সাহিত্যিকদের লেখা বইয়ের একটি তালিকা তৈরী করে দেবেন তো। একেকজনকে ধরে ধরে পড়বো।

— ও পড়বেন? আমি শুনলাম, ধরে ধরে মারবেন।

খোড়া বলল।

দৃপ্ত বলল, না-পড়ে খুব একটা মিস করেননি। তবে কিছু কিছু বই আছে, যা পড়াও যেতে পারে। তবে আপনার এই সিদ্ধান্তটা ভুল যদি আমার কাছ থেকে ভূগোল শিখতে চান আর ঝোড়ার কাছ থেকে বাংলা, তবে দুটোর কোনোটাই শেখা হবে না। বিষয় সম্বন্ধে যতটুকু মমত্ব বা দুর্বলতা ছিল ছাত্রছাত্রী ঠেঙিয়ে তা পুরোপুরি মরে গেছে।

ঝোড়া বলল, তাহলে কোথায় যাবে? নাকি আলিপুরদুয়ারেই ফিরে যাবে?

না-না বেরিয়েই যখন পড়েছি তখন ফিরবো না। বন-বাংলো না পেলেও রেঞ্জারের কোয়ার্টারে থেকে যাব।

দৃপ্ত বলল, কিন্তু, জায়গাতো পাওয়া গেল না। ফিরব না বললে তো হবেনা। তবে ফিরেই চলো। বরং শিকিয়াঝোড়াতে যাই চলো।

সে জায়গাটা কোথায়?

সে জায়গাটা আলিপুর দুয়ারের কাছেই। ভারী সুন্দর জায়গা। একটি ঝোড়া আছে। এক ভদ্রলোক ঘর ভাড়া দেন। খাওয়া দাওয়াও পাওয়া যায়। আউট অফ দা ওয়ার্লড প্লেস।

সেখানে আজ জায়গা না পাবারই কথা।

কেন?

আমার স্কুলের কজন মেয়ে আর দুই দিদিমণি সেখানে গেছেন।

ঠিক জানো?

হ্যাঁ। স্কুলের নতুন বাংলা ম্যাগাজিন বেরুবে তারই প্ল্যান করতে। তাহলে ফিরেই যাওয়া যাক। পরের উইকএন্ডে আপনি আবার আসুন অর্পণ, আমরা জয়ন্তীতে নিয়ে যাব আপনাকে, ভুটানঘাট হয়ে। রাইডাক নদীর শোভা দেখাব। আর বক্সার নিশ্ছিদ্র জঙ্গল।

তারপর অর্পণের দিকে ফিরে বলল, তাও যদি না জোটে তো জয়ন্তী নদী পেরিয়ে আপনার ছেলেবেলার তুরতুরি চা-বাগানে চলে যাব। সেখানে আমার বন্ধুর কোয়ার্টারে থেকে যাব। সন্ধের আগে আগে পৌঁছে গেলেই হলো। সন্ধের পরে এই পুরো অঞ্চলই হাতির রাজত্ব হয়ে যায়।

চলুন। আমার ড্রাইভার কিন্তু পাহাড়ি। ঘুম-এর। এদিকে ও আসেনি আগে। পথ বাৎলে দেবেন।

অর্পণ বলল।

দৃপ্ত ড্রাইভারের কাঁধে এক চাপড় মেরে বলল, চলো, দাজু। ওয়াপস চলো।

আমি বললাম, ও পরিষ্কার বাংলা বলে।

অর্পণ লক্ষ করল যে দৃপ্তর মধ্যে নেতৃত্ব দেবার এক সহজাত ক্ষমতা আছে। কিছু কিছু মানুষের মধ্যে থাকে। আরও অনেক গুণই নিশ্চয়ই আছে, নইলে ঝোড়ার মতো মেয়ে ওঁকে বিয়ে করবেই বা কেন? আজই সকালে ঝোড়ার মুখেই শুনেছিল যে ঝোড়া দৃপ্ত সেনের ছাত্রী ছিল।

অর্পণ ভাবছিল, পরে সময় করে ওদের প্রেম-কাহিনী শুনতে হবে।

অর্পণের মুখে এসে গেছিল, প্রায় বলেই ফেলেছিল, 'একেবারে শিশুবধ করেছেন মশায়'।

তারপরেই বলতে গেলে দৈবক্রমে বাক্যটিকে গিলে ফেলল।

আস্তে আস্তে এই সভ্যসমাজের যোগ্য হয়ে উঠছে অর্পণ। জেনে, নিজের ভাল লাগল। নিজেকে পরিমার্জন এবং নিজের স্বভাবের কিছু কিছু অংশকে বর্জন করতে পারার সঙ্গে একটা বিশেষ কিছু অর্জনের সাযুজ্য আছে মনে হলো সেই মুহূর্তে অর্পণের।

ঝোড়া বলল, সাংহাই রোড দিয়ে চলো।

সাংহাই রোড?

অবাক হয়ে বলল, অর্পণ।

হ্যাঁ। সাংহাই রোড। ঘন বনের মধ্যে দিয়ে দেখার মতো রাস্তা। লালি, দুধে লালি, আকাতরু, গামহার, চিকরাসি এবং আরো কত গাছ দেখতে পাবেন।

এখনই তো লালির ফল ধরার সময়, তাই না?

ঝোড়া জিগগেস্ করল দৃপ্তকে।

হ্যাঁ। তাই-ই তো।

অর্পণকে বলল ঝোড়া, ভারী সুন্দর দেখতে ফলগুলো। লাল, গোল গোল, টেনিস বলের চেয়ে ছোট গল্‌ফের বলের চেয়ে বড়। জলপাইগুড়িতে নিয়ে যাবেন কয়েকটি সঙ্গে করে ফেরার সময়ে। আলিপুরদুয়ারে অনেকেই ওই ফল দিয়ে ঘর সাজায়। আমাদের এই জংলী জায়গাতে আর কিই বা আছে!

অর্পণ মনে মনে বলল, ঝোড়া থাকাটাই তো যথেষ্ট।

সাংহাই রোডে গাড়ি ঢোকবার পরে অর্পণ দেখল সত্যিই গা ছমছম করে। ওর গাড়ি টাটা ইন্ডিকা। দৃপ্ত জোর করে লামার পাশে বসেছিল সামনে আলিপুরদুয়ার থেকেই। সাধারণত বাঙালি মানসিকতাতে সদ্যপরিচিত আগন্তুককে স্ত্রীর পাশে বসতে দিতে চান না কেউই। দৃপ্তর আত্মবিশ্বাস আছে। অর্পণের অবশ্য খুবই ভাল লাগছিল ঝোড়ার পাশে বসে। একটি আকাশি নীল সিল্কের শাড়ি পরেছিল ঝোড়া সঙ্গে তুঁতে-রঙা ব্লাউজ। কলকাতার মেয়েদের মতো ভুরুপ্লাব করেনি ও। ওর ভ্রু বিধাতাই এঁকে দিয়েছিলেন। সত্যি কথা বলতে কী প্রথম দর্শনেই অর্পণ বজ্রাহতর মতো মুগ্ধ হয়েছিল ঝোড়াকে দেখে, তার স্বাভাবিক সপ্রতিভাতে, তার চলন ও স্মিতিতে।

অর্পনের মনে পড়ল কার্তিকা চা-বাগানের কাছে একটি ছোট পুকুর ছিল পদ্ম আর কুমুদিনীতে ভরা। সেই পুকুরে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার অপূর্ব ঘোষের দুধলি হাঁসেরা সারাদিন ভেসে বেড়াতো, ওগুলি ও ছোট মাছ খেত। জানে না, হয়ত পদ্মবীজও খেত। তাদের ধবধবে কোমল গ্রীবা মুগ্ধ করত কিশোর অর্পণকে। জল ছিটকে উঠে গ্রীবাতে লাগত কিন্তু ভিজত না গ্রীবা। জলকণাতে সকালের নরম সোনারঙা রোদ পড়ে জহরতের মতো ঝিকমিক করত। ঝোড়ার গ্রীবার দিকে তাকিয়ে তার অপূর্ব ঘোষের সেই হাঁসিদের কথা মনে পড়ে গেছিল। ঝোড়াকে দেখে অর্পনের মনে হয়েছিল এতদিন কেন তার সঙ্গে দেখা হয়নি। সে তো হিল্লি-দিল্লি করে বেড়ানো। কলকাতার নামী কো-এড কলেজে পড়াশুনো করল। দক্ষিণ

কলকাতার সম্ভ্রান্ত পাড়াতে নতুন-বাবার এক পরিচিত ভদ্রলোকের বাড়িতে পেইং-গেস্ট থাকত। দক্ষিণ কলকাতার অগণ্য সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে তার দেখা এবং অনেকের সঙ্গেই পরিচয়ও হয়েছিল। কলেজের সহপাঠিনীদের মধ্যেও ডাকসাইটে সুন্দরী কম ছিল না। কিন্তু ঝোড়ার মতো কারোকেই চোখে লাগেনি। মনে ধরেনি। উত্তরবঙ্গের এই জঙ্গলবেষ্টিত অখ্যাত জায়গা আলিপুরদুয়ারে এসে সে এমন হোঁচট খাবে তা স্বপ্নেরও অতীত ছিল। মনে মনে দৃপ্তকে খুবই ঈর্ষা করতে শুরু করেছে অর্পণ। আর এই ঔদার্য এবং আত্মবিশ্বাস তাকে এক গভীর হীনম্মন্যতাতে ঠেলে দিচ্ছিল। ও ইন্ডিয়ান রেভেন্যু সার্ভিসের ক্লাস ওয়ান গ্রেড ওয়ান অফিসার হতে পারে, ইনকাম ট্যাক্সের অ্যাডিশনাল কমিশনার হতে পারে কিন্তু আলিপুরদুয়ারের এক অখ্যাত কলেজের ভূগোলের অধ্যাপক — নেহাতই সাদামাটা তৃণমূল-করা দৃপ্ত সেন তাকে জীবনের পরীক্ষাতে হ্যান্ডস ডাউন হারিয়ে দিল যে, এ-কথা মনে হওয়াতে তার মন এক তীব্র ধিক্কারে ভরে গেল।

ঝোড়ার বাঁ-হাতে একটা সোনার মটরমালা, গলাতে সোনার একগাছি পাতলা হার আর ডানহাতে টাইটানের একটি সস্তা হাতঘড়ি। আজকালকার অধিকাংশ আধুনিক মেয়েদের মতো চুল কাটেনি ঝোড়া। সুন্দর ঘন কালো চুলে খোঁপা বেঁধেছে একটি নীল রঙা ফুল গুঁজেছে খোঁপাতে। হালকা পারফ্যুমের গন্ধ ভেসে আসছে ওর শাড়ি, জামা, অন্তর্বাস থেকে। ওর পোশাকেই যদি এতো সুগন্ধি হয় তবে ওর শরীরের গন্ধ কে জানে কেমন হবে। ভাবছিল অর্পণ।

এ ব্যাপারে অর্পণ পুরোপুরিই অনভিজ্ঞ। আজ অবধি কোনো প্রাপ্তবয়স্কা নারীকে অনাবৃতা দেখেনি ও। ও জন্ম-রোম্যান্টিক। মেয়েদের সমন্ধে ওর জ্ঞান বড় কম এবং কম বলেই হয়ত মেয়েদের চারপাশে যে রহস্যের বলয় থাকে তা জ্যোতির্ময় হয়ে রয়েছে তার মনে। ঝোড়া তাকে মর্মে মর্মে রিক্ত, নিঃস্ব, ভিখারি করে দিয়েছে প্রথমবার দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই। এমন ঘটনার কথা আজকালকার দিনের যুবক-যুবতীরা ভাবতে পর্যন্ত পারে না হয়ত। কিন্তু আজকালকার মানুষ হয়ে মনে মনে ও অত্যন্ত প্রাচীন, রক্ষণশীল, তীব্র অনুভূতি সম্পন্ন মানুষই রয়ে গেছে। অন্য দশজনে যাকে সুখ বলে জানে, প্রাপ্তি বলে মানে, সহজ জয় বলে উল্লসিত হয় বা চিৎকার করে তা প্রচার করে, ও তাদের মতো নয়। ও ওরই মতো। তাই নারীরা তো বটেই খুব কম পুরুষই আজ অবধি ঠিকঠাক বুঝেছে ওকে। অবশ্য বোঝে যে নি, তা নিয়ে অর্পণের নিজের কোনো মাথা ব্যাথা নেই। বই পড়ে, গান শুনে, একা ঘরে তার সুখে দিন কাটে। তার কোনো অভাববোধ ছিল না কোনো ব্যাপারেই স্বল্পদিন আগে অবধি। আজ ঝোড়ার সঙ্গে আলাপিত

হবার পর থেকে ওর মধ্যে তীব্র অভাববোধ জন্মেছে, এক নিরুচ্চার আর্তিতে সে মথিত হচ্ছে। এত দিন বাদে যৌবনের মধ্যগগনে এসে যদি দেখাই হলো তার মানসীর সঙ্গে তবে সে অন্যের ঘরণী হয়ে তার সামনে কেন এলো? ওর জীবনে এই অপ্রত্যাশিত এবং সাংঘাতিক অভিঘাত কী অভিশাপ বয়ে নিয়ে আসবে তা ও জানে না।

ঝোড়া ভীষণই বুদ্ধিমতী। বুদ্ধিই তো মানুষের পরম সৌন্দর্য। চোখ নাক চিবুক বা গায়ের রং, শারীরিক গড়ন বা বাহ্যিক সপ্রতিভতাতে কোনো পুরুষ কিংবা নারীই প্রকৃত সুন্দর হতে পারে না। বুদ্ধিমত্তার সৌন্দর্য যার নেই সে কখনই সুন্দর হতে পারে না। আর বুদ্ধির সঙ্গে যদি বাহ্যিক সৌন্দর্যর মেলবন্ধন ঘটে তবে তা আর-ডি-এক্সেরই মতো অর্পণের মতো মানুষের বুকের মধ্যে বিস্ফোরন ঘটায়। আর সেই বিস্ফোরণ ঘটলে কোনো ডাক্তারের বা সার্জেনের বা পৃথিবীর আধুনিকতম হাসপাতালেরও সাধ্য নেই যে সেই মানুষকে বাঁচাবে। শরীর ছিন্নভিন্ন হলে তাকে মেরামত করা যায় কিন্তু মনের জগতে যদি বিস্ফোরণ ঘটে তবে তা মেরামত করার ক্ষমতা ঈশ্বর-আল্লা ছাড়া আর কারোরই নেই।

দেখেছেন, সামনে ওই ওয়াচ টাওয়ারটা?

ঝোড়া বলল, সামনে দেখিয়ে।

নিজের মনের ভাবনাতে বুঁদ হয়ে কোন স্বপ্নলোকে চলে গেছিল অর্পণ। যেন স্বর্গ থেকে ঝপ করে মর্ত্যে পড়ল।

বলল, কী ওটা?

চৌমাথা। ওইখানে পথ চলে গেছে চারদিকে। বাঘের মতো হলুদ কালো রং করা আছে ওয়াচ টাওয়ারের গায়ে।

সিমেন্টের তৈরি — পাকাপোক্ত। হাতির জন্যেই এমন করে বানানো। উপরে বসার জায়গা আছে, মাথার উপরে পাকা ছাদ — তবে টাওয়ারের চারদিকই খোলা। নিচে গার্ডরা থাকে। গাড়ি দাঁড় করাতে বলে দৃপ্ত তাদের সঙ্গে কথা বলল। গার্ড তখন একজনই ছিল সেখেনে।

তুমি একা কেন?

দৃপ্ত গার্ডকে জিগগেস করল।

একা নই। আরো দুজন আছে। আজ রাজাভাতখাওয়াতে হাট আছে। হাটে গেছে তারা। সারা সপ্তাহের বাজার তুলে আনবে। কোনো কোনো সপ্তাহে জয়ন্তীর হাট থেকেও আনে।

— বাঘ দেখা যায়?

অর্পণ শিশুর মতো ঔৎসুক্যে জিগগেস করল।

বক্সার জঙ্গলে বাঘ দেখা ভারী কঠিন। এমন জমাট বাঁধা জঙ্গল। একেবারে নিশ্ছিদ্র। বাঘ হয়ত আপনাদের দেখবে, আপনারা তাকে দেখতে পাবেন না।

দৃপ্ত বলল, সুন্দরবনের সঙ্গে খুবই মিল আছে এ ব্যাপারে। তবে এখানকার বাঘেদের মানুষখেকো — কুখ্যাতি নেই।

আপনি গেছেন, সুন্দরবনে?

অবাক হয়ে জিগগেস করল অর্পণ দৃপ্তকে।

একবার নয়, বহুবার। তবে আসল সুন্দরবন তো বাংলাদেশে। বাখরগঞ্জে। তা দেখার সুযোগ আর হলো কই? পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনে সুন্দরী গাছ কষ্ট করে খুঁজতে হয়।

একবার নিয়ে যাবেন আমাকে?

নিশ্চয়ই! ঝোড়াও তো গেছে আমার সঙ্গে বার-তিনেক। অতনুদার দয়াতেই দেখেছি অবশ্য।

অতনুদা কে?

অতনু রাহা। চিফ কনসার্ভেটর অফ ফরেস্টস। এখন চিফ প্রিন্সিপাল কনসার্ভেটর হয়ে গেছেন।

দৃপ্ত বলল, ঝোড়া যদিও অন্য বিষয়ের শিক্ষিতা কিন্তু ভূগোল ও বনজঙ্গল সম্বন্ধে ওর উৎসাহ আমার চেয়ে কম নয়। এই উৎসাহ ও পেয়েছে ওর বাবার কাছ থেকে। ওও যদি বনজঙ্গল এবং বন্যপ্রাণী ভাল না বাসত তবে ওর সঙ্গে আমার বিয়েটা টিকত কিনা সন্দেহ হতো।

তারপর অর্পণকে বলল, বিয়ে তো করেননি। করার আগে এই ব্যাপারটা বাজিয়ে নেবেন। দাম্পত্য অনেক কিছুর উপরে নির্ভরশীল। সহবাস করলেই দম্পতি হওয়া যায় না। শুধু গান শোনা বা বই পড়ার ব্যাপারে মিল থাকলেই দাম্পত্য সফল হয় না — আরও অনেক কিছু লাগে তাকে সফল করতে। চারদিকে চেয়ে দেখবেন কোটি কোটি দম্পতি — কিন্তু প্রকৃতার্থে দম্পতি কটি? বিশেষত আমাদের দেশে।

অর্পণ চুপ করে রইল। যে বিষয়ে ও কিছুমাত্র জানে না সে বিষয়ে কী আলোচনা করবে।

তারপর বলল, এত নুন ফেলা আছে কেন টাওয়ারের সামনে?

এই নুন জানোয়ারদের জন্যে। তৃণভোজী জানোয়ারদের শরীরের প্রয়োজনেই এই নুন চাটতে আসে ওরা। এগুলো বনবিভাগের বানানো 'নুনী' কিন্তু জঙ্গলের

মধ্যে মধ্যে প্রাকৃতিক নুনীও থাকে। ইংরেজিতে বলে Salt-lick জিম করবেট এবং অন্যান্য শিকারিদের লেখাতে পড়ে থাকবেন হয়ত।

জিম করবেটের নাম শুনেছি কিন্তু কোনো লেখা তো পড়িনি।

অর্পণ বলল।

বলেন কি মশাই! জিম করবেট আর রুডইয়ার্ড কিপলিং না পড়লে আপনাকে ভারতীয় বলেই মানতে রাজি নই আমি।

ঝোড়া বলল, এটা একটু বাড়াবাড়ি হলো তোমার। প্রত্যেক মানুষেরই ভারতীয়ত্বর রকম আলাদা। বিশেষ কিছু একটা না করলেই জীবন বৃথা হয়ে গেল এমন ভাববার কোনো কারণ আছে বলে মানি না আমি।

কথাটা হয়ত ঠিকই বলেছ তুমি।

দৃপ্ত বলল।

তারপর বলল, আমার বাবার কাছে একটা গল্প শুনেছিলাম। চা-বাগানের সাহেব ম্যানেজারেরা প্রতিবছর তিস্তার চরে বাঘ শিকার করতেন। শুধু ম্যানেজাররাই নন, তাঁদের সঙ্গে ডিভিশনাল কমিশনার, জঙ্গলের কনসার্ভেটর, পুলিশের বড় সাহেবরাও থাকতেন। কোনো কাজে বাবাকে একবার সেই ক্যাম্পে — ক্যাম্প মানে, সারসার তাঁবু খাটানো হতো — বেয়ারা, খানসামা, বাবুর্চি, নানা ডিপার্টমেন্টের হাতি এবং তাদের মাহুতেরা, পেশাদার শিকারিরা সবাই থাকত সেখানে। তা সেই সময়ে শামসিং চা-বাগানের ম্যানেজার ছিলেন রোনাল্ড রসস ম্যাকেঞ্জি। এক স্কটসম্যান। বাবা কাজে গেছিলেন তাঁরই কাছে। পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধে হয়ে গেছিল। সান-ডাউন হয়ে যাওয়াতে সাহেবরা হুইস্কি-সোডার মোচ্ছব করছিলেন। ম্যাকেঞ্জি সাহেব বাবাকে হুইস্কি অফার করাতে বাবা বলেছিলেন, থ্যাঙ্ক উ্য। আই ডোন্ট ড্রিঙ্ক।

ম্যাকেঞ্জি সাহেব তখন বলেছিলেন, উ্য ডোন্ট ড্রিঙ্ক? দেন হোয়াই ড্যু উ্য লিভ ফর?

বাবা সবিনয়ে বলেছিলেন, থ্যাঙ্ক উ্য ভেরি মাচ, বাট আই হ্যাভ আদার রিজনস ফর লিভিং।

ঝোড়া বলল, হায়! হায়! কী বাবার কী ছেলে।

দৃপ্ত হেসে বলল, যা বলতে যাচ্ছিলাম তুমি সেটাই গোলমাল করে দিলে।

কী বলতে চাইছিলে?

ঝোড়া বলল।

বলতে চাইছিলাম যে প্রত্যেক মানুষের কাছেই জীবনের সার্থকতা একেকরকম। কোনো পূর্ব-নির্ধারিত ছাঁচ নেই মনুষ্য-জীবনের। কোনো মানুষের জীবনেরই।

— যে যা করে আনন্দ পান, যে যেভাবে জীবনকে পূর্ণতর করে তুলতে পারেন, তিনি তাই-ই করবেন। অন্য-নির্দেশিত পথে চলার প্রয়োজনটাই বা কি?

অর্পণ বলল, ঊ্য হ্যাভ মেইড আ গুড পয়েন্ট। ঠিকই বলেছেন। সত্যি! আপনার মধ্যে খুব গভীরতা আছে। যত মিশছি, ততই মজে যাচ্ছি।

গভীরতা না ছাই!

ঝোড়া বলল, তাচ্ছিল্যের গলাতে।

দৃপ্ত সে কথার কোনো প্রতিবাদ করল না কিন্তু ঝোড়ার কথার ঢঙে মনে হলো কথাটা নিন্দা নয়, প্রশস্তিরই এক রকম। দাম্পত্যর এও এক ঝলক। অনেক ঝলকের সমষ্টি নিয়েই দাম্পত্যর ঘর।

একসময়ে সাংহাই রোড দিয়ে এগিয়ে শেষ বিকেলে জয়ন্তীতে গিয়ে পৌঁছল ওরা। মুগ্ধ হয়ে গেল শহরের ছেলে অর্পণ জয়ন্তী দেখে।

এখন নদীতে জল প্রায় নেই বললেই চলে। অপরপ্রান্তে একটি শীর্ণ ধারাতে বয়ে চলেছে জল। যতদূর চোখ যায় সাদা পাথরের, গুঁড়ো হয়ে যাওয়া বালির বিস্তার। দূরে একটি মোহনা আছে, সেখানে নদীকে অনেকই চওড়া মনে হয়। সেখানে নদী ডানদিকে ঘুরে গেছে। পাহাড়ের আড়ালে। এখান থেকে আর দেখা যায় না। নদীর ওপারেই ভুটান পাহাড়।

দৃপ্ত বলল, এই নদী পেরিয়েই চুনাখাওয়া ফাসখাওয়া নদীও পেরিয়ে তুরতুরি চা-বাগানের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় ভুটিয়া ঘাট। সেখান থেকে পিপিং। যেখানে ভুটানের গিরিখাত থেকে ওয়াঙ্চু নদী নেমে এসে ভরা যুবতীর সুগন্ধি কেশভারের মতো সমতলে ছড়িয়ে গেছে জলরাশি। উত্তরবঙ্গের সমতলভূমিতে আগল-খোলা স্বচ্ছতোয়া নৃত্যরতা নদী হয়ে বয়ে গেছে রায়ডাক বহুধারায়, মাঝে মাঝে ছোট ছোট প্রপাতের সৃষ্টি করে। কাল যাব আমরা সেখানে।

অর্পণ যেন এক ঘোরের মধ্যে রয়েছে। প্রথমত ঝোড়ার মতো একজন নারীর সঙ্গ — যদিও এ পর্যন্ত শুধুই সঙ্গ, সব ছোঁয়া-বাঁচানো সঙ্গ, মিছিমিছি বোকাবোকা সঙ্গ — তবুও তাই-ই ওর কাছে ঢের। দ্বিতীয়ত এই আশ্চর্য প্রকৃতি — এই প্রকৃতির অভিঘাত। অর্পণ অভিভূত হয়ে গেছে, সত্যিই এক ঘোরের মধ্যে আছে। কে জানে, ওকে আজ রাতে নিশিতে ডাকবে কি না।

সূর্য ডুবে গিয়ে একফালি চাঁদ উঠেছে। এই বন-জঙ্গলের শুক্লপক্ষে তৃতীয়া বা চতুর্থীর চাঁদও যে কত আলোতে পৃথিবীকে সিক্ত করে তা বনজঙ্গলের মানুষমাত্রই জানে। এই সিক্ততা কামার্তা কিন্তু অরমিতা যুবতীর ঊরুসন্ধির সিক্ততার মতো। সুগন্ধি, মসৃণ এবং পিচ্ছিল। এই সিক্ততার কথা শুধু মেয়েরাই জানে।

ট্টাক-টু-ড, ট্টাক-উ-উ করে গ্রেকো বা তক্ষক ডাকছে। একটা ডাকছে এপার থেকে অন্যটা, তার দোসর, সাড়া দিচ্ছে নদীর ওপার থেকে। নিস্তব্ধ পরিবেশ প্রতিবেশে সেই ডাক নদীর বিস্তীর্ণ সাদা আধো-অন্ধকার বুকে আর ভুটান পাহাড়ের জঙ্গলে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে যাচ্ছে ও ফিরে আসছে।

ওদের ভাগ্য ভালো। অথবা বলতে হবে, দৃপ্তর এলেম আছে। সে জয়ন্তীর বন বাংলোতেই জায়গা করে নিল। চৌকিদারের নাম নর্বু তামাং। সে আগে রাজাভাতখাওয়ার দু-নম্বর বনবাংলোতে ছিল। খুব ভালো রান্না করে এবং যত্ন করে খাওয়ায়। কয়েক বছর আগে যে বন্যা হয়েছিল তাতে পিডব্লিউডির পাকাপোক্ত সিমেন্টের পুরোনো বাংলোটিকে একেবারে শিকড়সুদ্ধ উপড়ে নিয়ে চলে গেছে। দু-একটি পিলারের ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে শুধু এদিকে-ওদিকে নদী ভুটানের দিকে যাবার শক্ত পোক্ত পাকা ব্রিজটাকেও দুর্দম প্রলয়ংকরী স্রোতে দুমড়ে-মুচড়ে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। এ পারের কাছে কিছু অংশ রয়ে গেছে, পোকায় খাওয়া দাঁতের মতো এক সময় ব্রিজ যে ছিল তার স্মৃতি হয়ে। 'খাণ্ডাহার বাতাতি হ্যায় ইমারত বুলন্দ থী।'

মালপত্র বলতে একটি করে ছোট অ্যাটাচি। মালপত্র ঘরে নিয়ে গিয়ে তুলল লামা। নর্বু তামাংয়ের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলেছে সে। কথাবার্তা নেপালিতেই বলছে। বসবার ঘরটি বেশ বড়। সেখানে বসে দিনরাত কাটিয়ে দেওয়া যায় নদীর আর নদীর ওপারের পাহাড়শ্রেণীর দিকে তাকিয়ে। এই বাংলোর সীমানাতে চুমু খেয়ে, বনবিভাগের কোনো আমলার সুকৃতির ফলেই হয়ত এর বিন্দুমাত্র ক্ষতি না করে বন্যার প্রলংয়করী বারিরাশি প্রবল পরাক্রমের গর্ব সত্ত্বেও ক্ষমতার শেষ সার্থকতা যে ক্ষমারই মধ্যে সে কথা প্রমাণ করে বনবাংলোকে পুরোপুরি অক্ষত রেখেই তার পা ছুঁয়ে বয়ে গেছে। সামনে এক থাবা মাঠ। তেমন যত্ন পায় না, তাই একটু অগোছালো। সেই লনে কয়েকটি শালগাছ। বেশি বড় নয়। এরা মানুষের ছেলেমেয়ে হলে ক্লাস নাইন-টেনে পড়ত এখন। তাদের গায়ে টিনের তকমাতে 'শাল' লিখে পেরেক দিয়ে সেঁটে দেওয়া হয়েছে।

দৃপ্ত বলল, কাণ্ডটা দেখলেন? বনের মধ্যে শালগাছ হবে না তো কী পাস গাছ হবে? কাণ্ডের উপরে নাম লিখে রাখার কী কোনো দরকার ছিল?

অর্পণ বেশ ভয়ে ভয়ে বলল, আলিপুরদুয়ার থেকে এতখানি পথ পেরিয়ে এলাম, পথে শালগাছ তো দেখলাম না একটাও। এই অঞ্চলে বোধহয় শালগাছ স্বাভাবিক গাছ নয়। বনবিভাগ হয়ত শালের প্ল্যানটেশন করেছেন কোথাও কোথাও। এই জয়ন্তী বনবাংলোর হাতাতে যে কটি গাছ লাগানো হয়েছে সে গাছ যে শালগাছই

তা জানাবার জন্যেই বোধহয় গাছের গায়ে তকমা দেওয়া হয়েছে। শালগাছ সব মানুষে চেনেনও না। এই তকমা, যাঁরা চেনেন না, তাঁদেরই জন্যে।

ওরা বাংলোর হাতার প্রান্তে — যেখান থেকে জয়ন্তী নদী খাড়া নিচে নেমে গেছে, সেখানের কংক্রিটের বসার জায়গাতে বসে চা খাচ্ছিল। চাটা অত্যন্তই ভাল। দার্জিলিংয়ের কোনো বাগানের চা, মকাইবাড়ি বা লপচু হবে। কলকাতাতেও এই সব চা পাওয়া যায় এবং অর্পণ চায়ের ব্যাপারে অত্যন্ত সৌখিন বলেই এসব খোঁজ-খবর রাখে।

ঝোড়া চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল, বাঃ। মনটা ভালো হয়ে গেল চা খেয়ে।

তারপর দৃপ্তর দিকে ফিরে বলল, নিজের জন্য দামি দামি মদ তো কিনতে পারো, একটু ভালো চা কিনতে পারো না। সখ বলে কিছুই নেই তোমার।

দৃপ্ত ঝোড়ার কথার উত্তর দিল না কোনো।

নর্বু তামাং আরও এক পট চা এবং দুধ ও চিনির পাত্র নিয়ে এলে দৃপ্ত তাকে বলল, রাতে কী রাঁধবে নর্বু?

যা বলেন স্যার। চিকেন করতে পারি, ডিম, আলু-পটলের তরকারি অথবা আলু বা পটল ভাজা, সঙ্গে টমেটো বা পুদিনার চাটনি।

অর্পণের খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কোনোই আগ্রহ ছিল না। মানে, এখানে নেই। নহলে, ও খুবই খাদ্য-বিলাসী। এখন ওর শুধুই ঝোড়াকে খেতে ইচ্ছে করছে। শুধু শুধুই খাবে, না কিছু মাখিয়ে খাবে তা স্থির করেনি কিন্তু জ্যাম-জেলিই হোক কী নরম সুগন্ধি হাল্কা হলুদ রঙা আমলেট। এখন ঝোড়াকে আমূল সিক্ত করে খুবই খেতে ইচ্ছে করছে ওর। জীবনে কোনো নারীকে খেতে ইচ্ছে করেনি আগে। ওর মধ্যে যে একজন নারীখাদক ছিল, গুহাবাসী ক্যানিবাল, তাও আগে দুঃস্বপ্নেও ভাবেনি। অর্পণ ভাবছিল, ওর এত পড়াশোনা, সুরুচি, এত সভ্যতা, বুদ্ধির চমক সবই কি পোশাকি? জন্মাবধি যে সুসভ্য বাতাবরণে নিজেকে মুড়ে রেখেছিল তা কি ঝোড়াকে দেখার পরে, তার সঙ্গে আলাপিত হয়ে এক লহমায় ছিঁড়ে-খুঁড়ে গেল? মানুষের সভ্যতার মলাটটি কি এমনই ঠুনকো? বারেবার ভাবছিল ও। আর গ্রেকো ডাকছিল ক্রমাগত, একটি নয়, একাধিক, এপার ও নদীর ওপার থেকেও। ও যেন কোনো আধিভৌতিক, বন্য পরিবেশ প্রতিবেশের শিকার হয়ে বনমানুষ না মানুষখেকো হয়ে উঠেছে। এই তীব্র জ্বলনেরই আরেক নাম কি কাম? ওর গাত্রতাপও হয়েছে একটু। এই জ্বরের নামই কি কামজ্বর? কে জানে? কত কিছুই তো জানত না অর্পণ। এই ঝোড়া নামের মেয়েটি দার্জিলিংয়ের পথের 'পাগলা

ঝোড়ার' মতো ওর এত যত্নে লালিত, এত গর্বে পালিত, এতো দিনের সংস্কৃত, বুদ্ধিজীবীর তকমা মারা এই বনবাংলোর শালগাছের মতো ঋজু, মাথা উঁচু মানুষটাকে ঝোড়ার পায়ের কাছে এমন ভূলুণ্ঠিত করে দিলো কী করে, কে জানে।

ঝোড়া কী ওর মনের কথা বুঝতে পারছে? ছি ঃ! ছি ঃ! বুঝতে পারলে, কী লজ্জার কথা হবে। অথচ না বুঝলেও তো কত কষ্ট পাবে অর্পণ। মেয়েদের এবং হয়ত পুরুষদেরও দুর্মূল্য শাড়ি-জামাতে মোড়া এই যে নগ্ন শরীর এর আকর্ষণ কি এমনই তীব্র যে মানুষের সব অর্জিত বিদ্যা, সব অর্জিত জ্ঞান কামতাড়িত হলে কী মুহূর্তের মধ্যেই শরীরী ঝড়ে উড়ে যায়? সাজানো-গোছানো মানুষ লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়? এমন অভিজ্ঞতা ওর জীবনে হয়নি এর আগে কখনও। অর্পণ এই নিজেকে চিনতই না, ও যে এত ভঙ্গুর, ওর সার্বিক অস্তিত্ব যে আলিপুরদুয়ারের মতো অখ্যাত জায়গার একটি অতি সামান্য মেয়ের দয়ার উপরে নির্ভরশীল, তার দয়াহীনতার উপরেও নির্ভরশীল তা তো সে কখনো জানেনি। এত মেয়ের সঙ্গে মিশেছে, এত মেয়েকে ছেলেবেলা থেকে নানা সূত্রে জেনেছে অথচ তাকে এমন প্রচণ্ড বিপজ্জনকভাবে কেউই প্রভাবিত করেনি। ও আজকে নতুন করে দ্বিজ হয়েছে, নবজন্ম হয়েছে ওর, নতুন সত্তাতে ও উদ্ভাসিত হয়েছে।

অর্পণের ঘোর ভাঙিয়ে দৃপ্ত বলল, শুয়োরের মাংস খাওয়াতে পারো নর্বু?

এখন কোথায় পাই? সাহেব ভুটিয়া বস্তি অথবা হ্যামিলটনগঞ্জ থেকে আনা যেত কিন্তু সে তো আনতে আনতে রাত কাবার হয়ে যাবে। বাস তো এখন নেই। কোনো ট্রাক ধরে যেতে হবে, যদি তা আদৌ পাওয়া যায়।

তা কেন? তুমি আমাদের গাড়ি নিয়ে যাও। লামা ড্রাইভারকে নিয়ে।

এদিকে হাট থাকলে পাওয়া যেত কিন্তু দুদিনের মধ্যে হাট নেই। আজ ছিল, রাজাভাতখাওয়াতে।

নর্বু বলল।

অর্পণ বলল, আমার এক বন্ধু হলংয়ে এলেই না কি শুয়োরের মাংস খায়।

বুনো শুয়োর? জেল হয়ে যাবে জানাজানি হলে।

দৃপ্ত বলল।

— না না, বুনো শুয়োর নয়। মাদারীহাটের হাটে যেসব শুয়োরের মাংস বিক্রি হয় তারা তো জঙ্গলেই চরাবরা করে। চামার বস্তির গু-খেকো শুয়োরত নয় তারা। তাই নাকি দারুণ স্বাদ।

— নর্বু বলল, কিন্তু রাঁধে কে? হলং বাংলোর বাবুর্চি তো মুসলমান। শুয়োর তো হারাম তাদের কাছে।

— রান্না নাকি করায় একজন মোদেশিয়া বেয়ারার বউকে দিয়ে। খুব কষে তেল-ঝাল দিয়ে তার বাড়িতে রান্না করে নিয়ে আসে সে। শুয়োরের চর্বি কচ্ছপের পিঠের খোসার মতো কচকচে খেতে। দারুণ লাগে খেতে।

— নর্বু বলল, কী করব বলেন?

দৃপ্ত বলল, আজকে ছাড়ো। কাল সকালে তাড়াতাড়ি করেই তো আমরা বেরিয়ে পড়ব ভুটানঘাট আর পিপিংয়ের দিকে। তুমি বাস ধরে গিয়ে যেখান থেকে পারো শুয়োরের মাংস যোগাড় করে নিয়ে এসে জম্পেস করে রান্না করো, সঙ্গে আমার মানী অতিথি আছেন, তাঁর খাতিরদারী করতে হবে। ইনকাম ট্যাক্সের কমিশানার।

নর্বু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল দৃপ্তর মুখের দিকে। তার সঙ্গে ইনকাম ট্যাক্সের কোনো সম্পর্কই নেই।

দৃপ্ত হেসে উঠল।

বলল, ইনকাম ট্যাক্স কমিশানারে কোনো দাম নেই, বনে কী জঙ্গলে। এখানে খাতির থানার দারোগার।

সেটা ঠিক।

অর্পণ বলল।

তারপর বলল, কাল আমাদের ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যাবে। ফিরে, শুয়োরের মাংস আর ভাত দিয়ে রাতের খাওয়া খাব জমিয়ে।

তারপর অর্পণের দিকে ফিরে বলল, কী বলেন স্যার? এই প্রোগ্রামে আপত্তি আছে?

অর্পণ বোকার মতো বলল, আপনিই তো লিডার। এতে আমার মতামতের কোনো ভূমিকাই নেই। আপনি যেমন সিধান্ত নেবেন, তেমনই হবে।

তারপর কিছুক্ষণ ওরা তিনজনেই চুপ করে রইল। চাঁদভাসি আকাশে একটি একটি করে তারা ফুটছে। রাত-পাখিরা নিস্তব্ধ পরিবেশকে ছিদ্রিত করে গম্ভীর ডাক ডাকতে ডাকতে উড়ে যাচ্ছে ভূটান পাহাড়ের দিকে। রাতের বেলা সাদা ছাড়া আর সব রঙের পাখিকেই কালো মনে হয়। সাদাকেও সাদা বলে চেনা যায় না খুব কাছ থেকে না দেখলে। পাখিদের গম্ভীর ডাক গ্রেকোদের ট্রাক্ট-উ, ট্রাক্ট-উ-উ ডাক ধু-ধু নদীর বুকে এক আধিভৌতিক পরিবেশের জন্ম দিয়েছে। ও পাশের পাহাড়ের নিচ থেকে হঠাৎই হাতির সংক্ষিপ্ত বৃংহন ভেসে এলো। অর্পণ সেই ডাক চিনতে পারেনি। চমকে উঠে বলেছিল, কী ওটা?

ঝোড়া বলল, হাতি।

ঝোড়া যেন অরণ্যকন্যা। এই পাহাড়, এই আকাতরু, শিরিষ, লালি, দুধেলালি, চিকরাসি, জাম, ছাতিয়ান, আর মাদার জারুলের মিশ্র জঙ্গলে, এই তিস্তা, তোর্ষা, জয়ন্তী, রায়ডাক, কালজানি, মূর্তি, নোনা আর ডিমাই নদীর অববাহিকাতে সে শৈশব থেকে যৌবনে পৌঁছেছে। এসবই তার ক্রীড়াভূমি। তাই বনফুলের গন্ধ তার চুলে, মূর্তি নদীর পাথরচাটা মাছের মসৃণতা তার বগলতলিতে, দুধেলালির রক্তিমাভা তার উরুসন্ধিতে। ও তো এসব জানবেই। ওই সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদের উপরে তার শিক্ষা, বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্যের বিভা তাকে বিভাবতী করেছে। অর্পণের নিধুবাবুর সেই বিখ্যাত গানটি মনে পড়ে গেল।

'তোমারি তুলনা তুমি প্রাণ, এ মহীমণ্ডলে।
যেমন আকাশে পূর্ণশশী, সেও কাঁদে কলঙ্কছলে।
গৌরবে কী সৌরভে কে তব তুলনা হবে।
যেমন গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা
আপনি আপন সম্ভবে।
তোমারি তুলনা তুমি প্রাণ, এ মহীমণ্ডলে।'

দু-পট চা খাওয়া হলে, ঝোড়া বলল, আমি চানে যাবো না তুমি যাবে আগে?

দৃপ্ত বলল, আমিই আগে যাই। আমার তো আবার সন্ধ্যা আহ্নিকের সময় হলো, ঈশার নামাজ পড়ারও। আমিই আগে যাই।

তারপর অর্পণকে বলল, আপনি যাবেন নাকি আগে?

আমার একটু জ্বরভাব হয়েছে। আমি চান করব না ভাবছি।

ওষুধ দেব নাকি কোনো? আমার কাছে ক্যালপল এবং ক্রোসিন আছে। প্যারাসিটামলও আছে। গা-হাত পা ব্যথা করছে কি? তাহলে খেয়ে নিন একটা। আরেকটা রাতে শোবার সময়ে খাবেন।

— না, না ওষুধ খাওয়ার দরকার নেই।

মনে মনে বলল, তোমার ওষুধে সারবে না এ জ্বর দৃপ্ত। যে ওষুধে সারবে তা তো পাওয়া যাবে না।

তারপর বলল, ওষুধ খাবার দরকার নেই। আমি চান করে এসে গরম জলে রাম্ সেজে দেব। গন্ধরাজ বা জঙ্গলের গোঁড়া লেবু দিয়ে তিন-চারটি মেরে দিয়ে নর্বুর হাতের মুগের ডালের ঘন খিচুড়ি আর কড়কড়ে করে আলুভাজা আর ওমলেট খেয়ে গ্রেকোদের ডাক শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়বেন, দেখবেন, কাল সকালে উ্যা আর ফিট লাইক আ ফিড্‌ল।

দৃপ্ত চানে গেলে ঝোড়া আর অর্পণ বসে রইল বাইরে। একটি পেঁচা আর

একটি পেঁচানি ক্রমান্বয়ে ঘুরে ঘুরে উড়ে উড়ে ঝগড়া করছে আর কিচি কিচি কিচর — কিচি-কিচর শব্দ করে। অনেক দূরে, যেখানে নদীর বিস্তীর্ণ সাদা শরীর বাঁক নিয়েছে ডানদিকে সেই বাঁকের উপরে এক জোড়া ওয়াটেলড ল্যাপউইঙ্গ ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে ডাকছে ডিড ড্যু ড্যু ইট? ডিড-ড্যু-ড্যু ইট? ডিড-ড্যু-ড্যু-ইট করে। অর্পণ শুনেছে যে, এই পাখি দুরকমের হয়, রেড ওয়াটেলড ল্যাপউইঙ্গ আর ইয়োলো ওয়াটেলড ল্যাপউইঙ্গ। ঝোড়া হয়ত অত না-ও জানতে পারে, তাই ওকে কিছু জিগগেস না করে চুপ করে উৎকর্ণ হয়ে রইল।

এই জয়ন্তী নদীটি কোথা থেকে এসেছে?

অর্পণ জিগগেস করল।

— এসেছে ভুটান থেকে। ভুটানের মহাকাল পাহাড় থেকে।

গেছে কোথায়?

গিয়ে মিশেছে রায়ডাক নদীতে।

ঝোড়া বলল, ওই দেখুন, বাংলোর হাতার শেষে একটি গামহার গাছে এক জোড়া র‍্যাকেট টেইলড ড্রঙ্গোর বাসা। পাখিগুলো মারকুটে। তাদের চেয়ে চেহারাতে অনেকই বড় পাখিকেও ওরা ভয় পায় না। আর এরা তো ভোরের শোরগ জেগে ওঠারও অনেক আগে এরা জাগে আর ওদের ডাকে শেষরাত মুখর করে তোলে।

আপনি এতো সব জানলেন কী করে?

— আমি তো এই পরিবেশেই বড় হয়েছি। গাছ-গাছালি পাখ-পাখালির মধ্যে। আমি তো আপনাদের ইট-কাঠের শহরের কিছুমাত্রই জানি না। শুধু এই সবই জানি। এতে আর বিশেষ কৃতিত্ব কী আছে।

অর্পণ চুপ করে রইল। ও ভাবছিল যে এই ঝোড়া কোনো পাহাড়ি ঝোড়ারই মতো স্বচ্ছতোয়া। ওকে সে শহরের ধূলিমলিন আবহে পেতো কোথায়?

রাত যত এগোচ্ছে তক্ষক বা গেকোগুলোর ডাকে ততই সরগরম হয়ে উঠছে জয়ন্তী। এই তক্ষকেরা অর্পণের দেখা তক্ষকের মতো নয়, যারা পেঁপেগাছে বা আমগাছে বা পোড়োবাড়ির চিলেকোঠা থেকে মানুষের কথার শেষে ঠিক, ঠিক ঠিক বলে ওঠে।

— এই গেকোগুলো অনেকই বড় হয়, না?

ঝোড়া বলল।

— গেকো কী জিনিস?

অর্পণ বলল।

— এই তক্ষকগুলোরই নাম গ্রেকো।

— বানান কী?

— Grecko

— তাই? সত্যি। কত কিছুই জানি না আমি!

— তারপর বলল, হ্যাঁ। বড় তো নিশ্চয়ই। কোনো কোনোটা এক হাত বা তার চেয়েও বড় হয়।

— সারা রাত ডাকবে ওরা?

— সম্ভবত ডাকবে। রাত যত গভীর হবে তত বেশি করে ডাকবে। যাঁরা বনে জঙ্গলে বেশি আসেন না এবং এই পরিবেশে অনভ্যস্ত তাঁদের তো প্রথম প্রথম ভয়ই করে।

— আপনি রিচার্ড বার্টন এবং এলিজাবেথ টেইলর-অভিনীত একটি ছবি দেখেছিলেন কি? "নাইট অফ দি ইগুয়ানো" অবশ্য ছবিটি অনেকই পুরনো। না হলে, লিজ টেইলর আর রিচার্ড বার্টন অভিনয়ই বা করবেন কী ভাবে? আমি সিডি দেখেছি আমার এক ফিল্মপাগল বন্ধুর বাড়িতে।

— ভাল ছবি বলতে এখানে কিছুই দেখা যায় না। ভাল সিনেমা হল তো নেইই। ডলবি সাউন্ড সিসটেম বা ফোর ডাইমেনশনাল ছবি দেখার মতো হলই বা কোথায়? সদর শহর জলপাইগুড়িতে হাইকোর্টের একটি সার্কিট বেঞ্চ পর্যন্ত হলো না এতোদিনেও। দেশের বিভিন্ন জায়গায় এখন মল। এই জলপাইগুড়ি জেলার অরণ্য পর্বত নদী ঝোড়া বন্যপ্রাণী আর চা-বাগান ছাড়া গর্ব করার মতো আর কিছুই নেই। অন্য অনেক জেলার চেয়েই আমরা পেছিয়ে আছি। এখন অবশ্য পর্যটন, শিল্প হিসাবে ধীরে ধীরে প্রাধান্য পাচ্ছে, বায়ো-ডাইভার্সিটি, একো-ট্যুরিজম, এনভায়রনমেন্ট এসব নিয়ে অনেকেই কচকচানি করে। আমাদের ছেলেবেলায় এইসব শব্দ শোনাই যেত না। আজকাল ওয়াইল্ডলাইফ ফোটোগ্রাফি, ওয়াইল্ডলাইফ নিয়ে লেখালেখি, এনভায়রনমেন্ট, ইকোলজি এসব নিয়ে অনেকে মেতেছেন কারণ এখন ওই সবই অর্থকরী বিদ্যা। স্বঘোষিত পরিবেশবিদে দেশ ছেয়ে গেছে।

— আর কিছু থাক না থাক ঝোড়া যে আছে এই তো গর্ব করার জন্যে যথেষ্ট।

— অর্পণ বলল।

ঝোড়া একটু অন্যমনস্ক ছিল। অর্পণের বাক্যটা ঠিক মনোযোগ দিয়ে শোনেনি। বলল, কোন ঝোড়া? কালিঝোড়া না পাগলা ঝোড়া?

— অর্পণ হেসে বলল, পাগলি ঝোড়া। আপনি — ঝোড়া!

— হেসে ফেলল ঝোড়া।

বলল, আপনি কী যে বলেন!

ঠিকই বলি।

— 'নাইট অফ দ্যা ইগুয়ানো' ছবিটি সম্বন্ধে আর একটু বলুন।

— বিশেষ করে বলার মতো কিছু নেই। তবে ইগুয়ানো মানে একরকমের উভচর প্রাণী — স্যালামান্ডারই হবে হয়ত, আমি এসব ব্যাপারে বিশেষ কিছু জানি না! — সুন্দরবনে নাকি দেখা যায় জল এবং কাদা দুইক্ষেত্রেই চলাফেরা করতে পারে স্যালামান্ডার। ইগুয়ানোদের দেখতে অনেকটা স্যালামান্ডার এবং কিছুটা তক্ষকের মতো — তাই তক্ষকদের দেশে এসে ছবিটার কথা মনে পড়ে গেল।

তারপর বলল, আপনাদের সঙ্গে কাটানো এই রাতের স্মৃতি চিরদিন বয়ে বেড়াতে হবে।

সুখ স্মৃতি না দুখস্মৃতি?

ভয়ের স্মৃতি।

ভয়ের কেন? বাঘ বা হাতির মুখে তো পড়েননি! বক্সার জঙ্গলে বাঘ খুব কম মানুষই দেখতে পান তবে বাঘেরা আমাদের ঠিকই দেখে। তবে হাতি দেখা যেতে পারে যখন তখন।

তারপর বলল, আমি যেবার বনবিভাগের এক বড় আমলার সঙ্গে গেছিলাম সুন্দরবনে, আমরাও দেখেছি যেই যেখানে [illegible] হয়েছে তারই কাছে, সেখানেই বাঘের টাটকা পায়ের ছাপ। মানে, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বাঘ আমাদের নজর করে বনের আড়ালে চলে গেছে। আর সুন্দরবনের জঙ্গল তো উত্তরবাংলোর জঙ্গলের মতো নয়। তবে বক্সার জঙ্গলের সঙ্গে কিছু মিল আছে, নিশ্ছিদ্রতার কারণে।

তারপরে বলল, তা ভয়ের কী দেখলেন আপনি আমাদের এই আলিপুরদুয়ার, রাজাভাতখাওয়া আর জয়ন্তীতে?

— ভয় তো এসবের কোনো জায়গাতে নেই, ভয় তো আছে সঙ্গেই। আমার বুকের মধ্যেই।

— মানে?

— ঝোড়া অবাক হয়ে বলল।

— আরো বিশদ করে বললে ভয়ের মাধুর্য নষ্ট হয়ে যাবে।

— ভয়েরও মাধুর্য থাকে বুঝি?

— থাকে বৈকি বিশেষ বিশেষ ভয়ে মাধুর্য থাকে।

— ঝোড়া উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইল।

একটুক্ষণ পরে বলল, আমার এতো 'আপনি' 'আজ্ঞে' ভালো লাগে না। দৃপ্তরও ভালো লাগে না। আপনি আমাকে তুমি করেই বলবেন।

— আর আপনি আমাকে কি বলে সম্বোধন করবেন?

— না, আমি আপনাকে তুমি বলতে পারব না! আপনি সব দিক দিয়েই আমার চেয়ে বড়। আপনাকে 'তুমি' বললে আপনাকে অসম্মান করা হবে।

— আমি যে সমানই হতে চাই। যে সমান তাকে কী করে অসম্মান করা যাবে? উঁচুতে যে থাকতে চাই না। তাছাড়াও আমার পক্ষেও 'তুমি' বলার একটু অসুবিধে আছে।

— অসুবিধে? কী অসুবিধা?

— তুমি-র মধ্যে একটু প্রেমময়তা তো থাকেই। কারোকে তুমি করে বললেই আমার প্রেম প্রেম ভাব হয়ে যায় তার সঙ্গে।

— ঝোড়া, পাহাড়ি ঝোড়ারই মতো হেসে গড়িয়ে পড়ে বলল, বা-বা আপনি দেখছি প্রেমের ঠাকুর। কেষ্টঠাকুরও বলা চলে। কিন্তু প্রেমকে অত ভয় পাবার কী আছে? প্রেম যদি হয়েই যায় তা হোকই না।

তারপর বলল, তাই যদি বলেন, মানে, প্রেমের কথা, তবে আজকালকার তুই-তোকারি করে ছেলেমেয়েরা একে অন্যের প্রেমে পড়ছে কী করে — তাদের মধ্যে অনেকে তো বিয়েও করছে। কোনো বাংলা উপন্যাসে পড়েছিলাম যে এক গ্রামে তুই-তোকারি করা এক সদ্যবিবাহিত দম্পতিকে তাঁদের একজন বর্ষীয়ান আত্মীয় একটি টিনের তোরঙ্গ উপহার দিয়েছিলেন — তার উপরে গোটা গোটা অক্ষরে লিখিয়ে দিয়েছিলেন সাইনবোর্ড লেখা শিল্পীকে দিয়ে ঃ 'সুখে শান্তিতে ঘর করো/ তুই-তোকারী বন্ধ করো'।

খুব জোরে হেসে উঠল ঝোড়া।

বলল, তাই? খুব মজার ব্যাপার তো।

এমন সময় চানটান করে পাজামা-পাঞ্জাবি পরে দৃপ্ত এসে বসল ওদের সঙ্গে।

বলল, এত হাসাহাসি কী নিয়ে হচ্ছিল?

ঝোড়া বলল তাকে, হাসাহাসির কারণের কথা।

দৃপ্ত বলল, অর্পণবাবুর কথাটাতে সার আছে। আমাদের প্রজন্ম 'তুমি'কে আশ্রয় করেই বড় হয়েছে, বিশেষ করে রোমান্টিকতার ব্যাপারে। 'তুমি যে তুমিই ও গো সেই ক্ষণ/ আমি মোর প্রেম দিয়ে শুধি চিরদিন' অথবা 'আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি তুমি অবসরমতো বাসিও/ আমি নিশিদিন হেথায় বসে আছি তুমি অবসরমতো আসিও।'

— আমাদের আগের প্রজন্ম কিন্তু 'আপনি' বলতে বলতেই প্রেমেও পড়ত, বিয়েও করত।

— তারও আগের প্রজন্ম, যখন ছেলেমেয়ের মধ্যে মেলামেশার সুযোগ খুবই কম ছিল, তখন ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির এম. এ ক্লাসে, হয়ত পুরো ক্লাসে একটি বা দুটি মেয়ে পড়তেন। তাঁরা অধ্যাপকের সঙ্গে ক্লাসে আসতেন এবং তাঁর সঙ্গেই ক্লাস শেষে চলে যেতেন। সেই ক্লাসে কোনো মেয়ের মাথার একটি চুল পড়ে থাকতে দেখে ছেলেদের মধ্যে কবিতা লেখার প্রতিযোগিতা চলত।

— তাই তখন অধিকাংশ প্রেমই ঘটত যৌথপরিবারের সদস্য মাসতুতো পিসতুতো খুড়তুতো, জ্যাঠতুতো ভাইবোনেরই মধ্যে — কারণ মেয়েদের সঙ্গে মেশার সুযোগ খুবই কম ছিল। মেয়েদেরও সুযোগ ছিল না।

— ঠিক তাই। দৃপ্ত বলল। নইলে সত্যজিৎ রায় হয়ত বা নিজের চেয়ে বেশ কয়েক বছরের বড় মাসতুতো বোনকে বিয়ে করতেন না। তিনি এমন কিছু সুন্দরীও নন।

— অর্পণ বলল, সে যুগে ওই রকম রক্ষণশীলতা ছিল বলেই দেখা যেত অধ্যাপকেরাই শিশুবধ করতেন সবচেয়ে বেশি। অনেকেই ছাত্রীদের সঙ্গে, [illegible]

— মানে, দেখা যেত রক্ষকেরাই ভক্ষক হয়েছেন।

— না, তা কেন? ঝোড়া বলল। প্রেমের প্রধান উপাদান হলো শ্রদ্ধা। অধ্যাপকেরা তখনকার দিনে অশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তাই অনেক ছাত্রীই তাঁদের প্রেমে পড়তেন। তাছাড়া এও সত্যি যে, ছেলেরা মেয়েদের সঙ্গে মেশার সুযোগ পেত না, মেয়েরাও পেত না ছেলেদের সঙ্গে মেশার সুযোগ। আত্মীয়-আত্মীয়ার মধ্যে বিয়ের সম্পর্ক না হোক প্রেমের সম্পর্ক এবং অনেক সময় শারীরিক সম্পর্কও হতো।

তারপর অর্পণ দৃপ্তকে বলল, আপনিও তো শিশুবধ করেছেন বলতে গেলে।

দৃপ্ত বলল, বধ হয়ত করেছি তবে শিশু ঝোড়া আদৌ ছিল না। অতি সেয়ানা মেয়ে ছিল। আমার ছাত্রী সে অবশ্যই ছিল। তবে তার ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ। — ঋজুতা তার চরিত্রের মস্ত বড় উপাদান ছিল। ছাত্রী তো অনেকই ছিল কিন্তু তাদের মধ্যে এই অল্পবয়সী মেয়েটির প্রতি আমি আকৃষ্ট হয়েছিলাম মুখ্যত তার ব্যক্তিত্বরই জন্যে যদিও তার চেহারাটাও দারুণ সুন্দর ছিল কিন্তু বিশ্বাস করুন, সত্যিই ওর ব্যক্তিত্বর টান ছিল আমার কাছে অনেকই বেশি।

ঝোড়া সম্বন্ধে 'সেয়ানা' শব্দটি কিন্তু ব্যবহার না করলেই ভাল হয়।

তারপর অর্পণ বলল, শারীরিক সৌন্দর্য এবং মানসিক সৌন্দর্যের এমন মেলবন্ধন সত্যিই বড় একটা দেখা যায় না।

— বেশি বেশি। আপনি কলকাতাতে ফিরে চোখের ডাক্তার দেখান। আর মাথার গোলমালও হতে পারে। নিউরোলজিস্টকেও দেখাতে পারেন।

ঝোড়া বলল।

দৃপ্ত অর্পণকে বলল, আপনি কি সত্যিই চান করবেন না।

ভাবছি করব না।

আপনাকে একটা ক্যালপল দিচ্ছি। তারপর গরমজলে লেবু ফেলে একটা বড় রাম সেজে দিচ্ছি। দুটো খাওয়ার পরে চান করে নিন। চানঘরে গিজার তো আছেই। চান করলে ভাল ঘুম হবে। রাতে ঠান্ডা পড়বে। এখনই কেমন ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব দেখছেন তো।

এই রাম 'সেজে দেওয়া' শব্দটা শুনে মাধুকরীর পৃথু ঘোষের কথা মনে পড়ল।

অর্পণ বলল।

— পড়েছেন মাধুকরী? তসলিমা নাসরিন আমাকে বলেছিলেন কলকাতাতে ওঁর সঙ্গে আলাপের সময় যে, মাধুকরী আমরা বাংলাদেশে কোরানের মতো পড়ি। আমাদের মাথার কাছে থাকে।

অর্পণ বলল, আমারও মাথার কাছে থাকে। শুধু তা নয়, রোজ যে কোনো পাতা খুলে পড়তে আরম্ভ করি আর পড়া আরম্ভ করলে আর ছাড়া যায় না। তারপর রাত গভীর হলে চোখের পাতা এমনিতেই জুড়ে আসে।

সত্যি কিছু কিছু বই থাকে ওরকম। এরকম বইকেই বলে ক্ল্যাসিক। কোনো মিডিয়ার ক্রমাগত প্রচারে কোনো বই কখনই ক্ল্যাসিক হয় না, হয় পাঠক-পাঠিকার হৃদয়ের উষ্ণ স্বীকৃতিতে বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্র-তারাশংকর-বিভূতিভূষণ-জীবনানন্দ-মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সতীনাথ ভাদুড়ীরা, আখতারুজ্জামানেরা যেমন হয়েছেন।

আমি তাহলে চানে যাই?

ঝোড়া বলল।

ঝোড়ার মতো কোনো যুবতী 'চানে যাই' বললেই অর্পণের বুকের মধ্যে ধড়ফড়ানি শুরু হয়।

দৃপ্ত বলল, জানেন তো, জয়ন্তীর এই বনবাংলোর চানঘরটি এক আশ্চর্য সৌন্দর্যের জায়গা — বিশেষ করে বন্যাতে পি. ডাব্লু. ডির বাংলো এবং ব্রীজটি নিশ্চিহ্ন হয়ে ভেঙে যাওয়ার পরে। জানলাগুলো খুলে দিয়ে চান করলে মনে হয় নদীর মধ্যেই বসে চান করছি। প্রাইভেসিরও কোনোই বিঘ্ন হয় না এই অঞ্চ

চাঁদের আলোতেও চানঘরে যথেষ্ট আলো আসে। নদী, চাঁদ, তারার মধ্যে চান করাতে একটা আশ্চর্য আরাম। বাংলোর চানঘরটি এমন উঁচু যে জানলা দিয়ে ভিতরে কিছু দেখার কারো উপায়ও নেই। তাছাড়া জনমানববর্জিত এখানে দেখবেই বা কে? এখানে 'ভয়রের' ভয় নেই।

— ঝোড়া উঠে যেতে যেতে বলল, আমি কিন্তু জানালা খুলে চান করতে পারব না তুমি যতই বলো।

— জানি। মেয়েদের জন্মগত সংস্কার থাকে নানারকম। তা ভাঙতে পারা ভারী কঠিন।

দৃপ্ত বলল।

— সংস্কার-টংস্কার আমার নেই তাই তো আমার নাম ঝোড়া। সংস্কার না থাকলেও তক্ষক তো আছে। তক্ষক তো নয় যেন গো-সাপ। এত বড় বড়। বাংলোর ফলস-সিলিংয়ের ভাঁজের মধ্যেও আছে। আমার ভীষণ ভয় করে প্রত্যেক অমেরুদণ্ডী প্রাণীকেই। সে সাপই হোক, কী তক্ষক।

অর্পণ বলল, আর মেরুদণ্ডহীন মানুষ যদি হয় কেউ?

— [illegible] ঝোড়া [illegible] বলল, ভয় তাকে করে না কিন্তু তার প্রতি অনুকম্পা হয়।

বলে, বনবাংলোর ভিতরে চলে গেল।

ঝোড়া এখন চান করছে। ঈশ্বর, মেয়েদের যে কত সুন্দর করে গড়েছেন তা মেয়েরা নিজেরা জানে না। কত পাহাড়-কন্দর। পদ্মফুলের পদ্মগন্ধী ফুলের মতো তাদের নাভিমূল। তাদের রহস্যাবৃত জঘন, চোখ, চিবুক, কপোল, তাদের স্তন-যুগল। অর্পণের সেই শায়েরিটির কথা মনে পড়ে গেল। 'নীগাহ্ যারে তাঁহা সীনে সে উঠকর, হুঁয়াতো হুসনকি দওলত গড়ি হ্যায়।' খোদা সুন্দরীদের সব দওলত তো স্তন-যুগলেই গড়ে রেখেছেন। 'অ্যায়সা ডুবাহুঁ তেরি আঁখোকি গেহরাইমে, হাত মে জাম হ্যায় মগর পীনেকি হোঁস নেহি।' মানে, তোমার চোখের গভীরে আমি এমনই ডুবে আছি যে হাতে আমার পানপাত্র কিন্তু চুমুক দেব যে, সে খেয়াল নেই। মীরের সেই শায়েরিটিও মনে পড়ে গেল 'পাত্তা পাত্তা বুটা বুটা হাল হামারা জানে হ্যায়, জানে ন জানে গুলহি না জানে, বাগ্‌তো সারা জানে হ্যায়'।

মানে, এই বাগান আর ফুল লতাপাতা সকলেই আমার বেদনার কথা জানে, ফুলই সে সবের খবর রাখে না, তাই তো তার কৃপা থেকে বঞ্চিত করে রাখে। দাগ-এর শায়েরিও মনে পড়ে গেল, 'এতো নহি কি তুমসা জাঁহামে হাসিন নহি, ইস দিলকা ক্যা করুঁ কি বহলতা নেহি'।

এমন তো নয় যে তোমার চেয়ে সুন্দরী আর দ্বিতীয় নেই কিন্তু করি কী? আমার হৃদয় যে অন্য কোথাওই নড়ে না।'

শায়েরির এই দোষ। একটা মনে পড়লেই অজস্র মনে পড়ে যায়। খোদার সঙ্গে তো তার অল্পদিনেরই দেখাশোনা। তাতেই তার শরীর-মন এমন করে মজে গেল কী করে তা ভেবে কূল-কিনারা পায় না অর্পণ। কেন যে এমন হয়। দেখাই যদি হলো তো এতদিন বাদে কেন হলো? আর হলোই যদি, তবে সে পরের ঘরণী কেন হলো? খোদার এ কী হরকৎ? অর্পণের কপালে এ কী দুঃখ তিনি এঁকে দিলেন!

সারমর সালানির একটি শায়েরিও মনে পড়ে গেল।

'চমনসে ইত্তলাতে বড়ো খুঁ সে বাত বনতি হ্যায়।

হামই হাম হ্যায়তো কেয়া হাম হ্যায়।

তুমহি তুম হো তো কেয়া তুম হো।'

মানে, আমি একা হলে আমি কেমন? তুমি একা হলেও সে তুমি কেমন? রঙ আর গন্ধ এই দুয়ে মিললে তবেই না ফুল-বাগিচার বাহার!

রামের গ্লাস সামনে রেখেছে অনেকক্ষণ।

দৃপ্ত বলল, কোথায় হারিয়ে গেলেন হঠাৎ আপনি?

অ্যাঁ? চমকে উঠে বলল অর্পণ।

তারপর বলল, আমি অমনই।

মাঝে মাঝেই আমি এমনি হারিয়ে যাই। ভিড়ের মধ্যে থাকলেও হারিয়ে যাই। এই আমার দোষ। আমাদের ফ্রেঞ্চ ক্লাসের প্রফেসর একদিন বলেছিলেন, সারা ক্লাসের সবাই-এর সামনে যে, ছেলেটা চাঁদে চলে গেছে। আমি জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে বসেছিলাম। ক্লাসে কী পড়ানো হচ্ছে সেদিকে কোনোই হুঁশ ছিল না। লজ্জাতে লাল হয়ে গেছিলাম। পরদিন থেকে আর যাইনি ফ্রেঞ্চ ক্লাসে।

দৃপ্ত বলল, ওতে লজ্জা পাওয়ার কী ছিল? 'কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা, মনে মনে'। এতো রবীন্দ্রনাথই বলে গেছেন।

তারপর বলল, আপনার কিন্তু সাহিত্য পড়াই উচিত ছিল। কী করে যে আপনি সেন্ট্রাল সার্ভিসেস পরীক্ষা পাশ করে রেভিন্যু সার্ভিসেসে জয়েন করে ডেবিট-ক্রেডিট নিয়ে পড়ে থাকেন কে জানে! আমার ইচ্ছে করে একদিন আমাদের প্রিন্সিপালকে বলে বাংলার ক্লাসে আপনাকে ভিজিটিং প্রফেসর করে এনে ক্লাস নেওয়ার।

উদ্বিগ্ন হয়ে অর্পণ বলল, কী যে বলেন! আমাকে বে-ইজ্জত করার কি অন্য কোনো পথ খোলা নেই?

গ্লাসের গ্লাসে চুমুক দিলো দুজনেই।

দৃপ্ত বলল, ঝোড়া মদ খাওয়া পছন্দ করে না। নিজে তো খায়ই না। আপনার মতো অন্য কেউ এলে, মুখে বলে, আমি খাই না, তবে আপনারা খেলে আমার আপত্তি কী?

মদ আমরা খাই কেন বলতে পারেন?

অর্পণ বলল।

ঠিক বলতে পারব না। হয়তো নিজেদের ভুলবার জন্যে খাই।

— নিজেদের কী করে ভোলা যায়? নিজেদের কোনো কৃত বা অকৃতকর্ম হয়তো ভোলা যায়।

— অর্পণ বলল, আমার এক মাসতুতো দিদি বিয়ে করে বিদেশে চলে যায়। সে যখন প্রথমবার ইংল্যান্ড থেকে ফেরে সে একবোতল স্কচ নিয়ে আসে। একদিন আমাদের সকলকে ডেকে খাওয়ায়।

— আমি বলেছিলাম, কেন খাসরে মিষ্টিদি?

— মিষ্টিদি বলেছিল, খেলে খুব খুশি খুশি লাগে। সারাদিনের ক্লান্তির পরে, নানাজনের দেওয়া নানা ছোট ছোট দুঃখের পরে, নিজেকে খুব হালকা লাগে। আমার [illegible] মামা এমন করে বলতেন? 'মান না কলঙ্ক' [illegible] বোঝাতে ইচ্ছে করে, আমার চারধারের জগতের আবর্তকে ভুলে গিয়ে নিজেকে সম্রাট বলে মনে হয়।

দৃপ্ত বলল বাঃ। আপনার মিষ্টি দিদি তো ফিলসফার। পৃথিবীর কোনো দুঃখকষ্টই তাঁকে ছুঁতে পারেনি নিশ্চয়ই।

অর্পণ একটু চুপ করে থেকে বলল, জানেন, মিষ্টিদি তার বছর তিনেক বাদে আত্মহত্যা করে মারা গেছিল।

চমকে উঠে দৃপ্ত বলল, সে কী? কেন?

আত্মহত্যা যে করে সে ছাড়া অন্য কেউই কি সঠিক জানে কেন সে নিজেকে নিভিয়ে দিল। লোকমুখে, মানে ইংল্যান্ডে আমার যেসব আত্মীয় বন্ধু ছিল তাদের মুখে শুনেছিলাম যে একটি ইংলিশ ছেলেকে নাকি ভালবেসেছিল। তার উপেক্ষার দুঃখেই নাকি ...

— আপনার দিদির মাথায় গোলমাল ছিল। ওরা ভালবাসার কি জানে! মরতে একজন ইংলিশ ছেলেকে ভালবাসতে গেল কেন? জামাইবাবু কি সেই জন্যে তাঁর উপরে অত্যাচার করতেন?

— না না। তিনি অন্য জাতের মানুষ। মাটির মানুষ। তিনি সব জেনেও কিছুমাত্র

বলতেন না। তাঁর সেই নিরুত্তাপই হয়ত মিষ্টিদিদির মনে একধরনের অনুশোচনার সৃষ্টি করেছিল।

— বুঝেছি; ওই মাটির মানুষই আত্মহত্যার কারণ। কোনো মানুষেরই তো মাটির মানুষ হওয়া উচিত নয় — রক্তমাংসের মানুষই হওয়া উচিত সব মানুষের। নিজের চেয়ে বড় হবার ভাণ যাঁরা করেন তাঁরা ভণ্ড হন।

— অর্পণ বলল. আমি যদি আপনার স্ত্রীকে ভালবাসি, আপনি কী করবেন? আমাকে খুন করবেন? না আত্মহত্যা করবেন?

— গ্লাসে একটা বড় চুমুক দিয়ে দৃপ্ত বলল, আপনার বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা নেই। আমি আপনাকেও খুনও করবো না, নিজেও আত্মহত্যা করবো না।

— আপনি একজন আশ্চর্য মানুষ তো।

মিনিট পাঁচ-সাতের মধ্যেই নিজের গ্লাসটা শেষ করে দৃপ্ত বলল, আমি ভীষণ তাড়াতাড়ি খাই। আপনার জন্যেও আরেকটা গ্লাস নিয়ে আসছি.

— না, না আমার সময় লাগবে একটিই শেষ করতে।

— [illegible] নিয়েই আসি আর [illegible] খাবেন।

— বারবার ওঠার চেয়ে বোতলটাকেই তো নিয়ে আসতে পারেন।

— না, না ভদ্রলোকেরা সামনে বোতল রেখে খান না। বস্তির লোকেরা খায়। আমরা তো ভদ্রলোক।

অর্পণ হেসে ফেলল দৃপ্তর কথাতে। বলল, আপনি হতে পারেন ভদ্রলোক, আমি অতি সাধারণ। পার্সোনাল বার্টেন্ডার থাকলে অন্য কথা

— নিজেদের জন্যে বারবার এত কষ্ট করার প্রয়োজন কী?

তাহলে নিয়েই আসব বলছেন?

হ্যাঁ। জলের জাগটাও নিয়ে আসুন। গন্ধরাজ লেবু একটা কেটে বসে।

আপনি তো গরম জল দিয়ে খাচ্ছেন।

অত ঝামেলার দরকার নেই আমার জন্যে। ক্যালপল এবং একটি গরম জলের রাম খেয়েই আমার শীতভাব চলে গেছে।

— বলছিলেন যে, জ্বরভাব হয়েছে।

— বললামই তো চলে গেছে।

ওগুলো নিয়ে ফিরে এসে আরেকটা বানিয়েই এক চুমুকেই প্রায় আধগ্লাস গিলে ফেলল দৃপ্ত।

বলল, এই আমার দোষ। ঘোড়া বলে, আমি তো মদ খাই না, মদই আমাকে

খায়। আসল ব্যাপারটা কী জানেন? যে শালারা গুনে গুনে মদ খায়, একটা, দেড়টা, আড়াইটা, সে শালারা সুদের কারবারী হয়, মানুষ খুন করতে পারে, কামিনা শালারা।

অর্পণ হেসে ফেলল দৃপ্তর কথাতে।

— দৃপ্ত বলল, জ্বর কতরকম হয় জানেন?

— ঠিক জানি না। টাইফায়েড, ম্যালেরিয়া, নিউমোনিয়া

— দুসন : ওসব জ্বর নয়।

— তবে?

— জ্বরের প্রকার তিন

— মানে?

— মানে একরকম : এমনি জ্বর। দুরকম : ভাল্লুকের জ্বর।

— ভাল্লুকের জ্বর মানে?

— ভাল্লুকের জ্বরের কথা শোনেননি। এই হু-হু করে কাঁপুনি দিয়ে আসে আর একটু পরেই ছেড়ে যায়। আবার আসে, আবার যায়। আপনার যদি কোনো প্রাণিতত্ত্ববিদ বন্ধু থাকেন তাঁকে জিগগেস করবেন তাহলেই আপনি আমার কথা যে বাজে কথা নয় তা জানতে পারবেন।

— তা, আমার কি ভাল্লুকের জ্বর হয়েছিল বলে মনে হয়েছিল আপনার? একটি ক্যালপল আর একটি রাম খেয়েই জ্বর সেরে গেল বলে?

— না, ঠিক তা নয়। ডাক্তার না হলেও আমি জ্বর-বিশারদ। আপনার যে জ্বর হয়েছে তার নাম কাম-জ্বর। আমাদের বাড়িতে খেতে বসার সময়ে আপনি যে দৃষ্টিতে ঝোড়ার দিকে চাইছিলেন সেই দৃষ্টি দেখেই আমি বুঝেছিলাম যে আপনি কাম-জ্বরে আক্রান্ত।

— মুখ নিচু করে অর্পণ বলল, ছিঃ ছিঃ কী লজ্জার কথা।

— রামের গ্লাসটা আর এক চুমুকে শেষ করেই দৃপ্ত বলল, এতে লজ্জার কী আছে? যে পুরুষের মাঝে মাঝে কাম-জ্বর না হয় সে তো ধ্বজভঙ্গ।

— তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, দেখুন, না 'তুমি' করেই বলি বরং। যাকে আমার পছন্দ হয় তাকে আমি 'তুমি' করেই বলি আর যাকে পছন্দ হয় না, তাকে 'আপনি'। দেখো, অর্পণ, আমার স্ত্রীকে প্রথমবার দেখেই তুমি কাম-জ্বরে আক্রান্ত হয়েছো এই সত্যটা তোমার পক্ষে যেমন গৌরবের আমার স্ত্রীর পক্ষেও তেমনই গৌরবের। একজন স্ত্রী বা পুরুষের স্বাস্থ্য কেমন আছে তা জানবার জন্যে আজকালকার রক্তচোষা ডাক্তারদের ডাকবার কোনোই দরকার নেই। যদি মাঝে মধ্যে কাম-জ্বর হয় তবে জানবে তোমার শরীর স্বাস্থ্য ফার্স্টক্লাস আছে।

আর খোড়ারও জানা উচিত যে, তার নারী জন্ম সার্থক। জলপাইগুড়ির ইয়াং হ্যান্ডসাম ইনকামট্যাক্সের অ্যাডিশনাল কমিশনার যে তাকে প্রথমবার দেখেই কাম-জ্বরে এমনভাবে আক্রান্ত হয়েছে এ তো তার পক্ষে সত্যিই পরম গৌরবের। আমার পক্ষেও পরম গৌরবের। আমি যাকে তাকে তো বিয়ে করিনি। এরকম স্ত্রী যার, তার তো গর্বিত হওয়ারই কথা।

— তারপর আরেকটি রাম ঢেলে নিয়ে বলল, তোমার ড্রিঙ্কটা শেষ করো, নইলে ওই গামহার গাছের র‍্যাকেট-টেইলড ড্রোঙ্গোদের তোমার পেছনে লেলিয়ে দেবো, নইলে পাহাড়ের ওপারের ভুটিয়া বস্তির হিংস্র ও লোমশ কুকুরদের। তোমাকে জ্যান্ত ঠুকরে ও কামড়ে খাবে তারা।

আতঙ্কিত গলাতে অর্পণ বলল, রাম না খাওয়ার জন্যেই এতবড় শাস্তি! তাহলে আপনার স্ত্রীকে দেখে কাম-জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার শাস্তি কী হবে।

— প্রথম শাস্তি আপনি বলার জন্যে। আপনি নয় তুমি। আমি কামিনা নই, আমাকে 'আপনি' বলবে না। দ্বিতীয়ত, কাম-জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার জন্যে তোমাকে দু গালে দুটি চুমু খাব। তাই হবে এই সাত-সকালে দাড়ি-কামানো, খড়খড়ে দাড়ি পাকিয়ে-যাওয়া কদর্শন পুরুষের কর্কশ চুমু — শাস্তি।

— অর্পণ বলল, [illegible] তুমি এক আশ্চর্য মানুষ দৃপ্ত।

দৃপ্ত বলল অবশ্যই আশ্চর্য। প্রত্যেকটি মানুষই আশ্চর্য, আমাদের দেখার চোখ নেই তাই বুঝতে পারি না। কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক নই। আমি ডাইনোসরদের কাজিন নই। যে যুগে মানুষে চাঁদে হাঁটে, মঙ্গলগ্রহ বা বৃহস্পতি থেকে পাথর কুড়োয়, সেখানে জলের সন্ধান করে, জমি কেনার জন্যে অগ্রিম চেক দেয়, সে যুগে চিঠি বাতিল করে ইন্টারনেট আর মোবাইলে প্রেম করে, মোবাইলেই প্রবাস থেকে বাবা-মায়ের কুশল শুধোয়, সেই যুগের একজন আধুনিক মানুষ। রক্ষণশীলতা ভাঙার কথা তোমাদের কলকাতা-দিল্লী-মুম্বাই-ন্যুইয়র্ক-টরেন্টোর অনেক মানুষই মুখে বলে কিন্তু কাজে দেখাতে পারে না — কিন্তু আমি পারি। আমি সেই রকমই একজন আধুনিক মানুষ। আমি যথার্থ আত্মবিশ্বাসী তাই আমার স্ত্রী আমাকে এত শ্রদ্ধা করে। আমি যাথার্থ আধুনিক, তাই সে জন্যেও সে আমাকে শ্রদ্ধা করে।

— স্তব্ধ হয়ে অর্পণ বসে রইল। এমন মানুষের সঙ্গে তার এ-যাবৎ মোলাকাত হয়নি। ভাবছিল, ইতিমধ্যে দৃপ্ত যদি রাম খেয়ে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়ে তবে বাকি রাত কী হবে। এই ক্ষ্যাপা মানুষের সঙ্গে এইরকম পাণ্ডববর্জিত জায়গাতে এসে সে ঠিক কাজ করেনি। মা-বাবার সব কথা শোনা বোধহয় ঠিক নয় প্রথমে

কৈশোরের নস্টালজিয়াতে আক্রান্ত হয়ে ও তুরতুরি বাগানের সারুমামার স্মৃতি জাগরুক হওয়াতেই এদিকে আসতে চেয়েছিল। ও কেন্দ্রীয় সরকারের একজন অত্যন্ত দায়িত্ববান এবং সম্ভ্রান্ত পদাধিকারী। এই রকম সঙ্গীকে তার এড়িয়ে চলা উচিত ছিল। আরো একটু খোঁজখবর নিয়ে আসা উচিত ছিল। বড়ই বিপদে পড়ল ও।

এমন সময়ে বাংলোর সিঁড়ি আলো করে একটি হালকা গোলাপি-রঙা শাড়ি আর ব্লাউজ পরে ঝোড়া এসে দাঁড়াল। ওকে দেখেই ভারী এক প্রশান্তি এলো অর্পণের মনে।

ঝোড়া হেঁটে ওদের দিকে এগিয়ে আসতেই বাংলোর হাতাটা সুগন্ধে ভরে এলো। কবে যেন গানটি শুনেছিল অর্পণ, 'আমার নয়নভুলানো এলে, কী হেরিলাম নয়ন মেলে' গানটির কথা মনে পড়ে গেল। মুগ্ধ মন বলে উঠল 'তেরি আঁখোকি কুছ কসুর নেহি, মুঝেহি খারাব হোনা থা'।

কাছে এসে, অর্পণের উলটোদিকে বসে ঝোড়া বলল, আপনি চানে যাবেন না?

দৃপ্ত দৃপ্ত ভঙ্গিতে বলল, আপনি নয়, তুমি।

আমি তো সেই কথা ভেবেই বলেছি। 'আপনি' করে বললে [illegible] করে [illegible] যায় না, [illegible] মানুষকে কাছের করা যায় না।

অর্পণ বলল, আমি কলকাতার কিছু কবি সাহিত্যিক আঁতেলদের জানি যাঁরা পঞ্চাশ-ষাট বছরের বন্ধুত্বের সমবয়সী বন্ধুদেরও 'আপনি' সম্বোধন করেন।

যে শালারা অমন বলেন তারা শয়তান।

কেন? শয়তান কেন?

'আপনি' বললে যে-কোনো মুহূর্তেই ঠেলে ফেলে দেওয়া যায় পুরোনো সম্পর্ক ছিঁড়ে ফেলে — কোনো শেকড় তো প্রোথিত থাকে না।

বা-বা এমন করে তো ভাবিনি কখনো।

ঝোড়া আবারও বলল, চানে যাওয়া হবে? না, সত্যিই জ্বর হয়েছে? ক্যালপল খেয়েও কমল না জ্বর?

এ জ্বর সে জ্বর নয়।

দৃপ্ত বলল।

ঝোড়া বলল, কোনো মানে নেই। বড় বাজে কথা বলো তুমি। যান অর্পণবাবু ভাল করে সাবান মেখে চান করে আসুন।

জ্বর তো হয়নি অর্পণের। জ্বরভাবই হয়েছিল শুধু কালপঙ্ক এবং রাম

খাওয়াতে সত্যি সত্যিই সেই ভাবটি চলে গেছে। তবে হঠাৎই চান করার একটা তীব্র ইচ্ছা ওর মনে জাগরূক হলো। যে চানঘরে এখনও ঝোড়ার শরীরের ওম্ ও সুগন্ধি মাখামাখি হয়ে আছে সেই চানঘরে চান করার কামনাতে সে উত্তেজিত হচ্ছে আর চান করলে কেমন লাগবে কে জানে। যে চানঘরে একটু আগেই ঝোড়া তার গ্রীবাতে, তার বগলতলিতে, তার স্তনসন্ধি ও উরুসন্ধিতে সুগন্ধি সাবান ঘষে চান করেছে সেই চানঘর তো নিশ্চয়ই হামামই হয়ে গেছে। যে রসিক, সে পুরুষই হোক কী নারী, সে অবশ্যই জানে যে, রমণের চেয়ে শৃঙ্গার অনেকই রমণীয়।

কথাটা মনে হতেই নিজের মনেই হেসে উঠল অর্পণ। যে পুরুষ আজ অবধি অরমিত, যে আজ অবধি কোনো পূর্ণবয়স্ক নারীকে নগ্নও দেখেনি, এই স্বল্পদিন আগে জলপাইগুড়ি এসে জীবনে প্রথমবার টাইগার হিল-এর সূর্যাস্ত দেখার সময়েও তার মনে হয়েছিল সে দৃশ্য অপরূপ কিন্তু কোনো নগ্নিকা দেখলে বোধহয় আরও বেশি মুগ্ধ হতো। দেরাদুনের খারাপ মেয়েদের এলাকাতে মুসৌরির এক রসিক ব্যাচমেট নিয়ে যেতে চেয়েছিল কিন্তু অর্পণ রাজি হয়নি। ওসব জায়গাতে যে পুরুষেরা যায় তারা সামাজিকভাবে বর্জিত। সোস্যালি কনডেমড কলকাতাতে থাকাকালীন অনেকের বন্ধুবান্ধব যেতেও, তাদের সংখ্যা কম ছিল না। তারাও অনেক সময়ে লোভ দেখিয়েছে। কিন্তু দক্ষিণ কলকাতাতে যে ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলার বাড়িতে পেয়িং-গেস্ট থাকতো নতুন বাবার এবং মায়েরও দাক্ষিণ্যে (তাঁরা দুজনেই প্রতিমাসে টাকা পাঠাতেন তাকে) সেখান থেকে কলেজ এবং কলেজ থেকে সেই বাড়ি ওই ছিল তার 'সর্কিট'। উত্তর কলকাতার সে কিছুই চিনত না। এখনও চেনে না। না, সারদা মায়ের বাড়ি যেমন চিনত না, সোনাগাছিও চিনত না। যে মেয়েদের যে-কেউই কড়ি ফেললেই বিবস্ত্র দেখতে পারে তাদের প্রতি অর্পণের কোনদিনই ঔৎসুক্য ছিল না, এমনকি মন-বর্জিত শরীর দেখার ইচ্ছাও ছিল না।

যাই চানটা করেই আসি. বলে উঠল অর্পণ।

অ্যাটাচিটা খুলে একটা পাজামা-পাঞ্জাবি বের করে শেভিং-কিটেংস থলেটা নিয়ে চান ঘরে ঢুকতেই আচ্ছন্ন হয়ে গেল অর্পণ। গিজারের জলে স্নান করেছে ঝোড়া — তার গায়ের ওম, সাবানের সুগন্ধ এবং গরম জলের ওমে চানঘর কবোষ্ণ হয়ে আছে। দরজাটা বন্ধ করে দিল দেখল, মস্ত চানঘরের এক কোনাতে ডার্টি-লিনেনবক্স এর মধ্যে ঝোড়ার ছাড়া শাড়ি, শায়া, ব্লাউজ এবং ব্রা। ব্রা এবং প্যান্টি সে সযত্নে শাড়ি-জামার নিচে লুকিয়ে রেখেছিল যাতে অর্পণের চোখে না পড়ে। ডার্টি লিনেন বক্সটি ঘেঁটেঘুঁটে দেখে নিচ থেকে ব্রা এবং প্যান্টিটি তুলে নিয়ে গালে ঘষল একবার অর্পণ। ও কি পার্ভার্ট? তা কেন হতে যাবে? যা কিছু সুন্দর

এবং সুগন্ধি তার সবকিছুর প্রতিই ওর তীব্র আকর্ষণ ছেলেবেলা থেকে। ঠাট্টা করে মা ওকে কখনো কখনো ডাকতেন 'গন্ধ-গোকুল' বলে।

তারপরে চানঘরের জানলাগুলো খুলে দিয়ে চানঘরের বাতি নিভিয়ে একটি জানলার সামনে দাঁড়াল। চানঘরের মধ্যে গিজারের লাল আলোটা শুধু জ্বলছিল টিমটিম করে। আর বাইরেটা যেন এক অন্য জগৎ। রহস্যময়, অপার্থিব, শুক্লপক্ষের চতুর্থীর ফিকে আলোতেই ধু-ধু সাদা জয়ন্তী নদীর বালুময় বুক এক আশ্চর্য সৌন্দর্য পেয়েছে। উলটো দিকের পাহাড়ে দাবানল জ্বলছে গোল হয়ে। তখনও তো তেমন গরম পড়েনি, দাবানলের সময় এখনও হয়নি। এতক্ষণ বাংলোর হাতাতে পাহাড়ের দিকে পিঠ দিয়ে বসেছিলো বলে দাবানলটি লক্ষ করেনি।

এতক্ষণ ও আর দৃপ্ত যতিহীন কথা বলছিল বলে বাইরের শব্দও কিছু শুনতে পায়নি। এখন স্বামী-স্ত্রীর নিচুগ্রামে বলা কথা ফিসফিসানির মতো ভেসে আসছে জয়ন্তী বন-বাংলোর হাতা থেকে।

ও ভাবছিল, একজন দম্পতির মধ্যে কতরকম কথাই না হয় , অবিবাহিতাদের পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়। তাই দম্পতিদের সঙ্গে কোথাও বাইরে এলে তাদের একটু একা থাকতে দিতে হয়। এই কথাটা মা একদিন বলেছিলেন [illegible] বাবাকে ওঁরা যখন এক বন্ধু দম্পতির সঙ্গে পুরী বেড়াতে যাচ্ছিলেন।

টাকটু-টাকটু-টাকটু করে তক্ষকেরা ডেকেই চলেছে। রাত যত গভীর হচ্ছে, পাহাড়ের ভিতরের জয়ন্তী গ্রামের সব শব্দ, শিশুদের কণ্ঠস্বর, গরু-বাছুরের হাম্বা রব, ছাগলের ব্যাঁ ব্যাঁ ডাক সবই থেমে গেছে অনেকক্ষণ হলো। উলটোদিকে আগে একটা ডোলোমাইটের কোয়ারি ছিল। পরিবেশবিদদের আপত্তিতে নাকি তা বন্ধ হয়ে গেছে বহুদিন হলো। কোনো আলো-টালো জ্বলে না এখন। প্রায়ান্ধকারে সাদা লম্বাটে বাড়িটা ভূতুড়ে বাড়ি বলে মনে হচ্ছে। জয়ন্তী নদী বাঁ-দিকে অনেকখানি এগিয়ে গিয়ে যেখানে ভুটানের দিকে ডানপাশে বাঁক নিয়েছে, সেখানে সেই একজোড়া পাখি ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে বুকের মধ্যে চমক তুলে ডেকে বেড়াচ্ছে ডিড-উ ড্যু-ইট? ডিড-উ-ড্যু-ইট। ওরা বিকেলেও যখন ডাকছিল তখন দৃপ্তও বলেছিল পাখিগুলোর নাম ল্যাপউইংস। দুরকমের হয় পাখিগুলো। ইয়ালো ওয়াটেলড আর রেড ওয়াটেলড। এগুলো ওই দুরকমের মধ্যে কোনরকম কে জানে! ওই পাখিগুলোর ডাক ওই নদীঘেরা রাতের রহস্য যেন বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। এবারে গরম আর ঠান্ডা জলের কল খুলল। দাড়ি তো কামাবে না। তাই আলো জ্বালল না। বাইরে থেকে আসা বিভাতে চানঘর বিভাময় হয়ে উঠেছে। আয়নাতে দীর্ঘদেহী নিজের অবয়ব ছায়া দেখে চমকে উঠল তর্পণ। চানঘরে কি কোনো ভাল্লুক ঢুকে পড়ল হঠাৎ? পরক্ষণেই ভুল ভাঙতে নিজের মনেই হেসে উঠল।

মাথা ভেজাল না। ভাল করে সারা শরীরে চন্দন সাবান মেখে চান করল ও। নারী-পুরুষের শরীর হচ্ছে মন্দির। সেই মন্দিরে কখন যে কোন ভক্ত ভক্তিভরে পুজো দিতে ঢুকে পড়ে তা কে বলতে পারে। তাই শরীরকে সবসময়ই সুন্দর ও পবিত্র করে রাখতে হয়। শুধু ভক্তই নয়, ঈশ্বরও আসতে পারেন অদৃশ্য শরীরে। এই কথা বলেছিল অর্পণকে উত্তরাখণ্ডের ঋষীকেশের কাছে কুঞ্জাপুরী পাহাড়ের মন্দিরের পূজারী। এখনও কথাটা মনে করে রেখেছে অর্পণ।

চান করে এসে বাইরে বসল ঝোড়া আর দৃপ্তর সঙ্গে। দৃপ্ত বলল, আরেকটা ঢালি তোমার জন্যে।

— না, না, আর নয়।

— সে কী। রান্না হতে দেরি আছে যে এখনো। নবু মুরগি ভাজাও করছে ক্রাম দিয়ে। ঝোড়া বাবুর্চিখানাতে গিয়ে দেখিয়ে দিয়ে এসেছে।

অর্পণ বলল, এই পরিবেশে, এই প্রতিবেশে এমনিতেই নেশা হয়ে গেছে আমার।

— তা বললে কী হয়।

দৃপ্ত বলল।

— জোর কোরো না ওঁকে।

— ঝোড়া বলল।

অর্পণ বলল, ঝোড়া যদি কিছু নেয় তাহলে নিতে পারি আরো একটা রাম।

ঝোড়া তো খায় না, খাওয়া পছন্দও করে না। তুমি যদি অনুরোধ করো তাহলে কী করবে তা আমি জানি না।

আপনি একটা জিন খান। বাবুর্চিখানা থেকে গন্ধরাজ লেবু আর কাঁচালংকা চিরে নিয়ে আসছি আমি

আপনার কিন্তু আমাকে তুমি বলে ডাকবার কথা ছিল।

তারপরে ঝোড়া বলল, আমার যদি নেশা হয়ে যায়?

নেশা হওয়ার জন্যে মানুষ কত কী করে। একদিন নেশাগ্রস্ত হয়ে দেখুনই না কী হয়!

অর্পণ বলল।

আবার আপনি।

ঠিক আছে, তুমি!

বেশি কী আর হবে। হয়ত অর্পণের সঙ্গে একটা অ্যাফেয়ার হয়ে যাবে

বড়জোর। হলে সেটাই বা দোষের কী? এই একঘেয়ে জীবনে একটু বৈচিত্র্য আসবে। ভালই তো।

দৃপ্ত বলল।

তার গলাটা সামান্য জড়ানো মনে হলো।

ঝোড়া দৃপ্তর এ কথার উত্তর দিল না।

জিন আমি আনছি। আমার অ্যাটাচিতে আছে এক বোতল। একজন দিয়েছিল আমাকে। এক বোতল স্কচ হুইস্কিও আছে।

দৃপ্ত বলল, একবার কুমারপ্রসাদ এসেছিলেন আলিপুরদুয়ারে একটি উচ্চাঙ্গ -সংগীতের অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করতে।

কোন কুমারপ্রসাদ?

আরে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখার্জির ছেলে কুমারপ্রসাদ মুখার্জি। কজন কুমারপ্রসাদ আছেন বঙ্গভূমে মানে ছিলেন আর কী। তিনি এক সংগীত-রসিক, সাহিত্যরসিক, হুইস্কিরসিক কুমারদা বলেছিলেন, লোকে কেন যে স্কচ হুইস্কি স্কচ হুইস্কি করে জানি না। হুইস্কি আবার স্কচ ছাড়া হয় নাকি?

ওরা সকলেই এই কথাতে হেসে উঠল।

[illegible]

ওঁর কুদরত রঙ্গিবিরঙ্গী পড়েছেন আপনারা?

অর্পণ বলল।

আবারও আপনি কেন? বলা হোক তোমরা।

হ্যাঁ, তোমরা।

ঝোড়া বলল, আমি পড়েছি, ও পড়েনি। দারুণ বই।

— অমিয়নাথ সান্যালের লেখা 'স্মৃতির অতলে' বইখানি কি পড়েছে। উচ্চাঙ্গ সংগীত এবং তার গায়ক-গায়িকাদের নিয়ে অমন রসবোধসম্পন্ন বই বাংলা সাহিত্যে আর নেই এবং ভবিষ্যতেও হবে না। ওস্তাদ কালে খাঁন, উস্তাদ ফৈয়াজ খাঁন, উস্তাদ মৈজুদ্দিন খাঁন ইত্যাদিদের নিয়ে লেখা। তাতে গহরজান, মালকাজান, চুলবুলে ও আগাওয়ালি বাইজী ইত্যাদি অনেক গাইয়েদের কথাও আছে। আছে নাটোরের মহারাজার কথা।

এক পণ্ডিত ওংকারনাথ ঠাকুর, পালুসকার সাহেব, নিবৃত্তি বুয়া, গাঙ্গুবাঈ হাঙ্গল, কেশরবাই কেরকার ইত্যাদি ছাড়া সে যুগের অধিকাংশ গাইয়ে-বাজিয়েরাই কিন্তু মুসলমান। উস্তাদ বিসমিল্লা খাঁ, বাবা আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব, উস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ সাহেব, উস্তাদ আলি আকবর খাঁ সাহেব, উস্তাদ কেরামতুল্লা খাঁ সাহেব, উস্তাদ জাকির হোসেন ইত্যাদিরাও।

— তা ঠিক, এবং এই তালিকা করতে হলে তো মিঞা তানসেনকে দিয়েই আরম্ভ করতে হয়।

দৃপ্ত বলল।

তারপর বলল, আসলে ভোগই বলো আর ত্যাগই বলো, খানাপিনাই হলো, কী গান-বাজনা, ফালানা-ঢামকানা এই সবকিছুতেই মুসলমানেরাই আগে আছে। এক এক জন নবাব যখন তাঁর সৈন্য সামন্ত, ঘোড়া, উট সব নিয়ে যুদ্ধের পর যুদ্ধ জয় করতেন, ভাবা যায়? তাঁর সঙ্গে তাঁর তিন-চারশ সুন্দরীর হারেমও থাকতো, গাইয়ে-বাজিয়েরাও থাকতো। দুই যুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালে তাঁরা কবিতাও লিখতেন, ছবিও আঁকতেন, বাবুর্চি খিতমদগার, হাজামৎ সবাই-ই থাকত সঙ্গে। মুসলমানেরা যেমন সহজে ভোগ করেছে তেমন সহজে পরাজয় স্বীকারও করেছে যুদ্ধে কিন্তু মানসিকতাতে তারা সবাই নবাবই ছিলেন। হেরে গিয়ে হাল ছাড়েননি। আবার নতুন করে সৈন্যদের সংগঠিত করে শত্রুদের আক্রমণ করেছেন।

গ্লাসে আরেক চুমুক মেরে দৃপ্ত বলল, মাণ্ডুতে একবার যেতেই হবে তোমার অর্পণ। মধ্যপ্রদেশের ধারের কাছে। নবাব বাজবাহাদুর আর গায়িকা রূপমতীর কাহিনী না পড়ে সেখানে যাওয়ার অবশ্য মানে হবে না।

অর্পণ উঠে ঝোড়োর জন্যে ডিনারের বন্দোবস্ত করতে গেল। যেতে যেতে দৃপ্তকে বলে গেল, তোমার বিষয় ভূগোল না ইতিহাস ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

ঝোড়া বলল, পেটে পড়লে ইনি সর্ববিদ্যাবিশারদ হয়ে যান। আর কারোকে কোনো কথাও বলতে দেন না।

অর্পণ ভাবছিল খেতে বসতে বসতেও এখনও তো দেড় দুঘন্টা দেরি আছে কমপক্ষে। ইতিমধ্যে দৃপ্ত যদি আরও খায় তাহলে প্রকৃতিস্থ থাকবে তো? অবশ্য না থাকলেই বা কী? নিজের বউকে জড়িয়ে শুয়ে পড়বে। আর কোনো বিপদ তো তার নেই। বরং অর্পণ অপ্রকৃতিস্থ হলে দৃপ্তর বিপদ হতে পারে।

অর্পণ সবকিছু একটি ট্রেতে সাজিয়ে নিয়ে এলো ঝোড়ার জন্যে।

টেবলের উপরে ট্রেটা রেখে দৃপ্তকে বলল, স্কচটা তোমাকে দিয়ে যাব।

ঝোড়া উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আপনি যথার্থই সাহেব। আপনি যাকে বিয়ে করবেন তিনি যথার্থই ভাগ্যবতী। বাঙালি পুরুষেরা, স্ত্রী যদি চাকরিও করেন, স্ত্রীকে দাসী বলেই মনে করেন। এই সব গার্হস্থ্যকর্ম করতে তাঁদের সম্মানে লাগে।

দৃপ্ত বলল, তুমি আমাকে কম্পানি দিয়ে দেখোই না আমি তোমাকে কেমন রানীর মতো দেখভাল করি।

তোমারই মতো আমিও যদি খেতে আরম্ভ করি তবে পাড়ার লোককেই আমাদের দেখাশোনা করতে হবে, পুলিশও ডাকতে হতে পারে।